প্লানচেটে পরলোকের কথা

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী

সাহিত্য সংস্থা ১৪/এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

PLANCHETTE-E PARALOKER KATHA
By Satish Chandra Chakravorty

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪/এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর—১৯৬৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
গণেশ বসু

মুদ্রক
রবীন্দ্র প্রেস
১২, যতীন্দ্র মোহন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

আত্মজা ও আত্মজায়াকে

যাহাদের ঐকান্তিক আগ্রহে

পরলোকরহস্য উদ্ঘাটনে উৎসাহিত হইয়াছিলাম।

লেখকের কয়েকখানি কালজয়ী গ্রন্থ

সন্তানের চরিত্র গঠন

হাসির লহর

পাতাবাহার

দূর্বাদল

নিবেদন

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়, সে রহস্য এই বৈজ্ঞানিক যুগে আজও মানুষকে কৌতূহলী করে। তাই দেখি প্রেততত্ত্ব নিয়ে দেশে বিদেশে লেখালেখি এ যাবৎ কম হয়নি। অদ্ভুত সব ঘটনার বিবরণ পড়ে মনে হয় বিজ্ঞান হয়তো বা এখনো মরণের পারের নাগাল পেল না।

আমার শৈশবে এই শহর কলকাতার শিক্ষিত সমাজে প্লানচেটের সাহায্যে পরলোক চর্চার একটা ঢেউ এসেছিল। সময়টা এই শতকের তিরিশের দশক। আমার পিতৃদেবও ১৯৩৬ সালে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ নিয়ে প্লানচেটে আত্মা আনার ব্যাপারে দিনকতক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। এই পুস্তক তারই দিনলিপি। এতকাল তা পাণ্ডুলিপি আকারে পড়েছিল। আজ মনে পড়ে পিতৃদেব তাঁর শেষ জীবনে তেমন মনোযোগী শ্রোতা পেলে কি উৎসাহের সংগে ঐ পাণ্ডুলিপির আদ্যপান্ত পড়ে শোনাতেন। শ্রোতারা অনেকেই তখন বই ছাপিয়ে প্রকাশ করার পরামর্শ দিতেন তাঁকে। পিতৃবন্ধু শিশুসাহিত্যিক স্বর্গত কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত 'প্রবাসী' পত্রিকায় পিতৃদেবের এই প্লানচেটে পরলোকচর্চার বিবরণ দিয়ে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। কিন্তু পিতৃদেবের চরিত্রের প্রচারবিমুখতাই পুস্তকখানি সেই সময়

প্রকাশের অন্তরায় হয়ে পড়ে। প্রকাশক শ্রীরণধীর পালের একান্ত আগ্রহে এতকাল বাদে ঐ অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ছাপানো হলো।

আত্মার অমরত্ব নিয়ে কোন দার্শনিক আলোচনা এই বইয়ে নেই। যে সব মৃতজনের আত্মা আনা হয়েছিল পিতৃদেব নানা কৌশলে সহজ সরল প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁদের অস্তিত্বের সত্যতা যাচাই করতে চেষ্টা করেন মাত্র। একালের পাঠক যদি একবার অবিশ্বাসকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দিয়ে পিতৃদেবের এই দিনলিপি-গুলি পড়ে দেখেন, মনে হয় পিতৃদেবের মতো তাঁরাও হয়তো বা একালেও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়তে পারেন।

পি-১২৫/ডি, বিধান পার্ক
কলকাতা-৭০০০৯০

জীবিতেশ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

১	সূচনা	...	১
২	খোকন (১)	...	৫
৩	খোকন (২)	...	১২
৪	অশ্বিনীকুমার দত্ত	...	১৪
৫	খোকন (৩)	...	২০
৬	পিতাঠাকুর	...	২৫
৭	হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১)	...	৩২
৮	Stephenson	...	৩৮
৯	জগদীশ মুখোপাধ্যায়	...	৪৪
১০	শ্রীদাদা (১)	...	৪৬
১১	কালীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	...	৪৯
১২	জগদীশ দাস	...	৫০
১৩	আত্মার ভোজ	...	৫৭
১৪	অনুকুল সেন	...	৫৯
১৫	তারানাথ	...	৬২
১৬	শ্রী-মা	...	৬৮
১৭	শ্রীদাদা (২)	...	৭০
১৮	ছোড়্দিদি	...	৭২
১৯	খোকন (৪)	...	৭৮
২০	হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় (২)	...	৭৯
২১	আত্মা আনিবার বিপদ	...	৭৯
২২	নীচ আত্মা	...	৮৪
২৩	উপসংহার	...	৮৫

সূচনা

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৯২৮ সনের জানুয়ারী মাসে ১৪ বৎসর বয়সে আমাদের কলিকাতার বাহির সিমলার বাসাবাটীতে পরলোক গমন করে। তাহার মৃত্যুর পরেই তাহার মায়ের পীড়াপীড়িতে আমি তাহার আত্মা আনাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলাম এবং আমার বাল্যবন্ধু হাইকোর্টের উকিল খুলনার মূলঘর নিবাসী জিতেন্দ্রনাথ রায়কে ঐ উদ্দেশ্যে আমাদের বাটীতে আহ্বান করি। জিতেন বরিশাল জিলার খ্যাতনামা জমিদার ও সাহিত্যিক কীর্তিপাশার রোহিনীবাবুর জামাতা। আমি অপরের মুখে শুনিয়াছিলাম স্ত্রী-বিয়োগের পর জিতেন বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার আত্মা আনিয়া অনেক অদ্ভুত রহস্য জানিতে পারে এবং সে ঐ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতাও লাভ করে। আমি অবশ্য এসব বিশ্বাস করিতাম না। তাই তাহার সংগে এসব বিষয়ে কোনদিন কোন আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি নাই। প্লানচেট নামটা বাল্যকালে যেদিন প্রথম শুনিয়াছিলাম সেই দিনই এক ব্যক্তির সংগে তর্ক করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম উহা পূর্ণ চীট্। তথাপি স্ত্রীর মনের ঐ শোকাহত অবস্থায় যে উপায়েই হোক কিছু শান্তি দান করার কথা ভাবিলাম। জিতেন আসিয়া বলিল যে, পুত্রের আত্মা আনিলে ছোট ছেলে বলিয়া তাহার বিশেষ কষ্ট হইবে এবং মায়া বাড়িয়া তাহার পারলৌকিক অনিষ্টও হইতে পারে। ঐ কথা শুনিয়া আমি আমার মতলব পরিত্যাগ করি। কিন্তু জিতেনের মুখে তাহার নিজের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া বিশেষ কৌতুহলপ্রবণ

হইয়াছিলাম। আগেকার দৃঢ় অবিশ্বাস সন্দেহে আসিয়া পেঁছিয়া ছিল। জিতেন অবশ্য প্লানচেট ছাড়া অন্যান্য উপায়েও আত্মা আনিত।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে বরিশাল জিলার ফয়রা গ্রাম নিবাসী জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে কলিকাতায় আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। তিনি খুব ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। সকলের নিকট তিনি 'অন্ধ কবিরাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি গ্রে ষ্ট্রীটে থাকিয়া অন্ধ অবস্থায় কবিরাজী করিতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—'কবিরাজ মহাশয়, যদি আমি আগে মারা যাই তবে আপনাকে পরলোক সম্বন্ধে সংবাদ দিতে চেষ্টা করিব; আর আপনি যদি আগে মারা যান তবে আপনিও আমাকে ঐ সংবাদ দিতে চেষ্টা করিবেন।' তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বহুদিন হইল কবিরাজ মহাশয়ের কাশীধামে দেহান্তর ঘটিয়াছে কিন্তু তিনি উপাযাচক হইয়া আমাকে কোন সংবাদই দেন নাই। আজ মনে হয় উপাযাচক হইয়া ওরূপ করা সম্ভবও নয়।

আমার জামাতা ১৯৩৪ সনের নভেম্বর মাসে বরিশাল জিলার কুন্দিহার (বানাড়িপাড়া) গ্রামে তাহার নিজ বাটীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯৩৬ সনের এপ্রিল মাসে তাহার পরিচিত ও স্ব-গ্রামবাসী একজন ব্যক্তি আমার অনুপস্থিতি কালে আমাদের বাসায় আসিয়া প্লানচেটের সাহায্যে আমার কন্যা ও স্ত্রীর সাক্ষাতে আমার জামাতার আত্মা আনে। ঐ লোকটি তাহাদের নিকট বলে যে, আমার পুত্রের একখানি ফটো পাইলে সে তাহার আত্মাও আনিতে পারে। আমার স্ত্রী ও কন্যার নিকট আমি ঐ সব কথা শুনিলাম। আরও শুনিলাম যে আমার কন্যার হাতেও নাকি আত্মা আসে। সে ঐ লোকটির নিকট হইতে একখানা প্লানচেটও সংগ্রহ করিয়াছে। তাহারা উভয়েই আমার পুত্রের আত্মা আনিবার জন্য আমার অনুমতি চাহে। আমি জিতেনের কথা উল্লেখ করিয়া উহাতে

অস্বীকৃত হই। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের কোন সাড়া নাই দেখিয়া তাঁহার আত্মা আনিতে বলি। কারণ তিনি সাধু ব্যক্তি ও পুত্র-কলত্রহীন ছিলেন। আত্মা আনিবার ফলে মায়া বাড়িয়া তাঁহার অনিষ্ট হইবার আশংকা ছিল না। বিশেষতঃ তিনি ঐ সম্বন্ধীয় সংবাদ দিতে প্রতিশ্রুতও ছিলেন। আমার নিজের মনে এই প্লানচেট ব্যাপারের উপর বেশ একটা অবিশ্বাসের ভাব বর্তমান ছিল। হয়ত বা মিডিয়ামের নিজের চিন্তা অনুযায়ী হস্তের পেশী অজ্ঞাতে চালিত হইয়া তাহার নিজের ভাবগুলিই লেখা হইয়া যায়। সুতরাং আমি নিজে প্লানচেট না ধরিয়া আমার কন্যা ও স্ত্রীকে কবিরাজ মহাশয়ের আত্মা আনিতে বলি। তাহারা উভয়েই কবিরাজ মহাশয়কে একাধিক বার আমাদের বাসায় দেখিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল কেহই জানিত না। এরূপ অবস্থায় যদি প্লানচেটে তাঁহার প্রকৃত নামটি লেখা পড়ে, তবে ব্যাপারটির সত্যতা উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না! আমার ঐ সন্দেহ নিরাকরণের জন্যও 'অন্ধ কবিরাজের' আত্মা আনিতে বলি। সেইদিন রাত্রে উহারা উভয়ে একত্রে প্লানচেট ধরিয়া বসিবার অল্প পরেই প্লানচেট নড়িয়া উঠিল। আমি প্রশ্ন করিলাম,—'আপনি কে?' উত্তরে লেখা হইল,—'তারানাথ'।

আমি লেখাটা পড়ি নাই। আমার কন্যা পড়িয়া বলিল,—কবিরাজ মহাশয়ের নাম কি তারানাথ? আমি মনে মনে বলিলাম—এইবার প্লানচেট ব্যাপারটার বুজরুকি ধরা পড়িল। কারণ সাধারণতঃ নামজাদা লোকের বা আত্মীয়ের আত্মাই আনা হয় এবং পূর্বোল্লেখিত সহজবোধ্য কারণেই সত্য নামটি লিখিত হয়। অথচ মিডিয়াম যে জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্বক অন্যকে বঞ্চনা করে, তাহা নহে। বরং পেশীর অজ্ঞাত সঞ্চালনের ফলে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে বঞ্চিত হইয়া থাকে। উহারা বারংবার প্লানচেট ছাড়িতে ও ধরিতে লাগিল। কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে প্রতিবারই লেখা হইল,—'তারা-

নাথ'। আমি বিরক্ত হইয়া শুইয়া পড়িলাম। উহারা গৃহ-সংলগ্ন ছাতে বসিয়া পুনরায় চেষ্টা করিতে লাগিল। বাড়ির আরও একজন স্ত্রীলোক আসিয়া তাহার আত্মীয়ের আত্মা আনিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিল। উহাদের গোলমালে আমি ঘুমাইতে পারিলাম না। উঠিয়া গিয়া বলিলাম, এইবার তোমরা খোকনের আত্মা আনিতে চেষ্টা করিতে পার। কারণ তাহাকে আনিতেই পারিবে না। সুতরাং তাহার কষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। অনর্থক কেন আর তোমাদের মনে দুঃখ রাখিব ? তোমরা ভাবিবে চেষ্টা করিতে দিলে খোকন আসিত। তখন মায়ে-ঝিয়ে সানন্দে খোকনকে আহ্বান করিল। এবারেও একটা উত্তর,—'তারানাথ'।

আমি প্রশ্ন করিলাম,—'তোমাকে তো ডাকিনা, তবু কেন বার বার আস ?' কোনই উত্তর নাই।

প্রঃ—তুমি কি আমাদিগকে চেন ?

উঃ— না।

প্রঃ—তোমার নাম তো তারানাথ,—পদবীটা কি ?

কোন উত্তর পাইলাম না।

প্রঃ—কোথায় থাক ?

উঃ—তাল—

ঐটুকু লেখা হইতেই আমার মেয়ে প্লানচেট ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—'বাবা এটা ভূত। ঐ দেখুন না, বোধহয় তাল গাছে থাকে লিখিতে যাইতেছিল।' তখন তাহারা প্লানচেটখানা গঙ্গাজলে ধুইয়া লইল। আমি পুনরায় শুইয়া পড়িলাম। খানিক বাদে আমার স্ত্রী আমাকে জাগাইল এবং বলিল,—'এইবার খোকন আসিয়াছে'। আমি বলিলাম, 'কি করিয়া বুঝিলে ?' স্ত্রী বলিল, —'সে তার নাম লিখিল পরিতোষ। আমি কে জিজ্ঞাসা করায় বলিল বৌমা।' [খোকন তাহার মাকে বৌমা বলিয়া ডাকিত।] আমি হাসিয়া বলিলাম,—'ও প্রশ্নের তো এরূপ উত্তর হইবেই।

অত সহজে বুঝা যায় না যে খোকন আসিয়াছে।' উত্তরে শুনিলাম, —'তুমি তো কিছুই বিশ্বাস কর না। নিজে আসিয়া তোমার ওকালতি জেরা করিয়া দেখনা।' নেহাৎ অবিশ্বাস-জনিত অনিচ্ছায় পুনরায় উঠিয়া গিয়া প্রশ্ন করিলাম।

খোকন (১)

প্রঃ—তুমি কে ?

উঃ—খোকন।

প্রঃ—ভাল নাম কি ?

উঃ—পরিতোষ।

প্রঃ—তোমার ও আমার জানা কিন্তু তোমার দিদির ও বৌমার অজানা কোন কথা লেখতো।

উঃ—মনে পড়ে না।

আমি—চিন্তা করিয়া দেখ।

উঃ—মৃত্যুর পূর্বে নারিকেল খাইতে চাহিয়াছিলাম।

[এ কথাটা সত্য। ঐ সময়ে আমার কন্যা শ্বশুরবাড়িতে ছিল কিন্তু আমার স্ত্রী তো কলিকাতায় ছিল। সুতরাং তাহার হয়তো উহা জানা ছিল। প্লান্‌চেট উভয়েই ধরিয়াছিল। তাই অন্য প্রশ্ন করিলাম।]

প্রঃ—তুমি মৃত্যুর পূর্বে একদিন রাস্তায় দু'খানা দশ টাকার নোট পাইয়াছিলে। কোন্ রাস্তায় পাইয়া ছিলে বল তো।

উঃ—রাস্তার নাম মনে পড়ে না।

আমি—এতদিন পরে হয়তো ভুলিয়া গিয়াছ। বেশ আমি কতকগুলি রাস্তার নাম করি। শুনিলে হয়তো মনে পড়িতে পারে। শিবনারায়ণ দাস লেন, যদুনাথ সেন

লেন, প্রাণনাথ সেন লেন, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী ষ্ট্রীট, রঘুনাথ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, শংকর ঘোষ লেন।

উঃ—বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে পাইয়াছিলাম।

প্রঃ—সংগে আর কে ছিল ?

উঃ—মেজকাকা আর ধীরেশ কাকা।

[আমার কন্যা তখন কলিকাতায় ছিল না। উহার মাও রাস্তার নাম জানিত না।]

প্রঃ—তুমি যখন স্কুলে ভর্তি হইতে চাহিতে আর আমি ভর্তি করিতাম না, তখন কোথায় ভর্তি হইতে চাহিয়াছিলে ?

উঃ—কলেজ [আমি থামাইয়া দিয়া বলিলাম—]

আমি—হাঁ, স্কুলে না পড়িতেই কলেজ ! ঠিক করিয়া লেখ।

উঃ—ঠিকই তো লিখিতেছিলাম 'কলেজ স্কোয়ারের পুকুরে'।

প্রঃ—তারপরে আমি কি বলিয়াছিলাম ?

উঃ—তুমি কি ব্যাং ?

[নন্-কোঅপারেশন করিয়া ওকালতি ছাড়িয়া কি করিয়া ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করি ? এইজন্য উহাকে আদৌ স্কুলে না দিয়া অবসর সময়ে নিজে বাড়িতে পড়াইতাম। বন্ধু অধ্যাপক মধুসূদন সরকার একদিন বলিল—আপনি খোকনের অভিভাবক হইবেন না। আমিই অভিভাবক হইয়া উহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিব। আমি আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি বেতন দিব না। তাহাতে সে বলে, আমি উহাকে ফ্রি করিয়া দিব। আমি বলিয়াছিলাম, আমার ছেলে ফ্রি-তেও পড়িবে না। সকলের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাহাকে যখন কিছুতেই স্কুলে ভর্তি করিতেছিলাম না তখন খোকন একদিন আমাকে বলিল যে পাড়ার ছেলেরা তাহাকে খেলিতে লয় না। তাহারা বলে যে রাস্তার ছেলেদের সংগে মাষ্টারমহাশয়রা তাহাদিগকে খেলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। আমি নাকি

রাস্তার ছেলে! বই না হয় আপনার কাছে বাড়িতে পড়িলাম, কিন্তু খেলিব কাহার সংগে? আমাকে স্কুলে যদি ভর্তি না করেন, তবে কলেজ স্কোয়ারের পুকুরে ভর্তি করিয়া দিন। আমি জানিতাম না যে গোলদীঘিতে সাঁতারের ক্লাব হইয়াছে এবং খোকন সেখানে ভর্তি হইতে চাহিতেছে। তাই আমি ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলাম, পুকুরে ভর্তি হইবে? তুমি কি ব্যাং? এই ঠাট্টার কথাটা অবশ্য কেবলমাত্র আমরা দুজনেই জানিতাম। তাহার মা ও দিদি কেহই জানিত না।]

আমি—আমার তিনটি প্রশ্নেরই খুব সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছ। সুতরাং আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি যে তুমি খোকন। খোকন, বাবা, তুমি কেমন আছ?

উঃ—ভাল না।

প্রঃ—কেন?

উঃ—গয়ায় পিণ্ড দেওয়া হয় নাই।

প্রঃ—আমি শীঘ্রই পিণ্ড দিব। খোকন, তুমি কিছু খাবে?

উঃ—খোকন নাই খাবে কে?

আমি—ঐ যে তুমি আছ।

উঃ—শরীর নাই।

প্রঃ—তোমার বর্তমান অবস্থাটাকে কি বলে?

উঃ—আত্মাবস্থা।

প্রঃ—আত্মা না প্রেতাত্মা?

উঃ—আত্মা।

আমি—তোমার কথায় বুঝিলাম তোমরা কিছু খাইতে পার না। তবে তো শ্রাদ্ধাদিতে যা কিছু দেওয়া হয় সবই অনর্থক? [আমার ঐ ধারণাই ছিল।]

উঃ—না, অনর্থক না। দেখিয়া তৃপ্ত।

প্রঃ—কিরূপ তৃপ্ত?

উঃ—খাইবার মতই তৃপ্তি।

প্রঃ—তুমি কি খাইতে ইচ্ছা কর ?

উঃ—চম্‌চম্‌। [জীবিত খোকন চম্‌চম্‌ খাইতে ভালবাসিত অবশ্য এ কথা মিডিয়ামরা জানিত।]

আমি—আজ এত রাত্রে দোকান খোলা নাই। কাল চমচম কিনিয়া আনিয়া তোমাকে ডাকিব।

উঃ—আচ্ছা।

আমি—ভাল কথা, খোকন, তুমি বর্তমানে যে স্থানে আছ ঐ স্থানটার নাম কি ?

উঃ—অমরধাম।

আমি—অমরধাম ! অমর মানে তো দেবতা। অমরধাম তো তবে স্বর্গ।

উঃ—না, ইহা স্বর্গ না।

আমি—তুমি যে দেখিয়া তৃপ্তির কথা বলিলে ঐটা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চাই। তুমি জীবিত থাকিতে স্পঞ্জ (Sponge) রসগোল্লা বাহির হয় নাই। তোমাকে যদি এখন ঐরূপ রসগোল্লা দিই, তুমি কি স্পঞ্জ রসগোল্লার আস্বাদ পাইবে ?

উঃ—না, সাধারণ রসগোল্লা আস্বাদের তৃপ্তি পাইব। [বুঝিলাম আত্মারা স্মৃতির সাহায্যে আস্বাদজনিত তৃপ্তি পাইয়া থাকে।]

আমি—তুমি রাগ করিও না। আমি তোমাকে যা খাইতে দিব বলিয়াছি, তা নিশ্চয়ই দিব। কিন্তু একটা কথা বলি। তোমাদের যখন দেখিয়া তৃপ্তি হয় এবং সে তৃপ্তি ঠিক খাইবার মতই, তখন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে, কলেজ স্ট্রীটে, মায় ভীমনাগের দোকান পর্যন্ত যত মিঠাইয়ের দোকান আছে সবগুলির কাছে গিয়া কেন প্রত্যহ নানারূপ মিঠাই খাইবার তৃপ্তি উপভোগ কর না ?

উঃ—কেহ না দিলে তৃপ্তি হয় না। আর ওরূপ দৃষ্টি দিতে নাই।

প্রঃ—কেন?

উঃ—নিষেধ আছে।

প্রঃ—কার নিষেধ?

উঃ—ভগবানের।

প্রঃ—ভগবানের! নিশ্চয়ই তুমি তাঁহাকে দেখ নাই।

উঃ—না দেখি নাই।

প্রঃ—তবে তাঁহার নিষেধ কেন বলিলে?

উঃ—আমাকে ছাড়, আমাকে ছাড়।

[খোকন আমার সঙ্গে 'আপনি'-আজ্ঞা' বলিয়া কথা বলিত। 'ছাড়' শব্দটি কেন লিখিল প্রথমে বুঝি নাই। পরে চিন্তা করিয়া বুঝি যে উহা সে তাহার দিদি ও বৌমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে। কারণ আমি প্রশ্নকর্তা মাত্র, প্লানচেট তো তাহারাই ধরিয়াছে। প্লানচেট না ছাড়িলে খোকনের আত্মার যাইবার সাধ্য ছিল না।]

আমি—যাক্। ও প্রশ্নের জবাব আমি চাই না। তুমি কি নিজে আর কিছু বলিতে চাও?

উঃ—ভালবাসা—[এইটুকু লিখিতেই আমি প্লানচেটটা সরাইয়া রাখিয়া বলিলাম।]

প্রঃ—ভালবাসা জানাইতে চাও? যাক তোমার আর সামাজিকতা করিতে হইবে না। খুব ভালবাসা দেখাইয়া গিয়াছ!

উঃ—না! ভাল বাসায় যান।

প্রঃ—কেন? এ বাসার কি হইয়াছে?

উঃ—এ বাসা ভাল না। এখানে থাকিবেন না।

আমি—এখানে বহুদিন বেশ সুবিধামত আছি। এটা হঠাৎ ছাড়া কঠিন।

উঃ—এখানে থাকিলে ভুনু মরিবে।

[আমার বড় দৌহিত্রকে আমার জামাতা ভুনু বলিয়া ডাকিত। 'ভুনু মরিবে' এই লেখা পড়িয়া আমার কন্যা কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল, 'এইবার আমি শেষ হইলাম।']

প্রঃ—খোকন, তুমি মরিবার পূর্বে তো উহার 'ভুনু নাম' শুনিয়া যাও নাই। আমরা তো উহাকে 'টম্' বলিয়া ডাকিতাম। এখনও ডাকি। তোমার পক্ষে 'টম্' বলাই তো স্বাভাবিক ছিল। তুমি 'ভুনু' বলিলে কেন?

উঃ—জামাইবাবুর নিকট ঐ নাম শুনিয়াছি।

প্রঃ—জামাইবাবু! জামাইবাবু কোথায়?

উঃ—এই যে এখানেই।

আমি—জামাইবাবুকে প্লানচেটে উঠিতে বল।

উঃ—না, তিনি উঠিবেন না।

আমি—তুমি চম্‌চম্ খাইতে আসিবার সময়ে তাহাকেও আনিও এবং সে কি খাইতে ইচ্ছা করে জানিয়া এখনই বল।

উঃ—ফল। [জীবিতাবস্থায় আমার জামাতা ফলই ভালবাসিত।]

প্রঃ—আচ্ছা খোকন, আত্মা আনিতে বসিলেই তারানাথ আসে। ও লোকটা কে বলিতে পার?

উঃ—ওটা ভুত।

প্রঃ—ও কোথায় থাকে?

উঃ—এই বাড়িতেই।

প্রঃ—এখানে কোথা হইতে আসিল?

উঃ—ও এই বাড়িতেই থাকিত।

প্রঃ—তারপর?

উঃ—তারপর গঙ্গায় ডুবিয়া মরে।

প্রঃ—গঙ্গায় ডুবিয়া মরিলে তো ঊর্ধ্বগতি হয়।

উঃ—আত্মহত্যা।

[খোকনের এই উত্তর শুনিয়া বুঝিলাম এ বাড়িতে ভূত আছে। খোকনের কাছে এই কথা শুনিয়া জামাতা হয়ত খোকনের কাছে বলিয়া থাকিবে যে তার দুরন্ত ছেলে ভুনু নিশ্চয়ই রাত্রে একাকী কোথাও তাকে দেখিয়া ডরাইয়া মরিবে। তাই খোকন জামাতার ভাষায়ই 'ভুনু মরিবে' বলিয়াছে। জামাতার ওরূপ বলিবার যে আরও গুরুতর কারণ ছিল তাহা তখনও আমি বুঝিতে পারি নাই। যা হউক আমি উহাদের এই কথাটা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার বাক্য বলিয়া মনে না করিয়া জামাতার সাধারণ বুদ্ধি-প্রণোদিত কথা বলিয়াই ধরিয়া লইলাম এবং আমার কন্যাকেও বুঝাইয়া বলিলাম। ভূতের ভয়ে বাড়ি ছাড়িবার পরিবর্তে বাড়ি হইতে ভূত ছাড়াইবার চেষ্টায় মন দিব স্থির করিলাম।]

আমি—এ বাড়ি না ছাড়িলে ভুনু মরিবে এটা তোমার কথা না জামাইবাবুর কথা ?

উঃ—জামাইবাবুই ওকথা আমাকে বলিয়াছেন।

প্রঃ—বাড়িতে ভূত আছে জানিয়া ওরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছে মাত্র, তাই নয় ?

উঃ—হাঁ।

আমি—আচ্ছা আজ তবে যাও। কাল পুনরায় ডাকিব। জামাইবাবুকে নিয়া আসিও চমচম ও ফল খাইতে।

উঃ—আচ্ছা।

ইহা ২৬. ৪. ৩৬ তারিখ গভীর রাত্রির ব্যাপার। পর দিন জামাতা ও খোকনের উদ্দেশ্যে পূর্ব প্রতিশ্রুত খাবার দিয়া তাহাদিগকে সবাই স্মরণ করিতে লাগিলাম এবং কিছুকাল পরে প্লানচেট ধরা হইল। প্লানচেট নড়িতেই প্রশ্ন করিলাম।

খোকন (২)

আমি—কে ?

খোকন—আমি খোকন।

আমি—তোমাকে ও জামাইবাবুকে যে খাবার দেওয়া হইয়াছে তাহা তোমরা পাইয়াছ তো ?

খোকন—না বাবা, পাই নাই।

আমি—সে কি কথা ! চমচম, ফল তোমাদিগকে দেওয়া হইল, তা পাইলে না কেন ?

খোকন—তারা শালা সব নষ্ট করিয়াছে। আমরা আসিয়া দেখি সে আগেই বসিয়া গিয়াছে।

আমি—তোমরা দুজনেও তার সাথে পারিলেনা ?

খোকন—তার গায়ে যা দুর্গন্ধ ! সেখানে দাঁড়ানো যায় না।

আমি—আচ্ছা বাবা, আর একদিন তোমাদিগকে ডাকিয়া খাওয়াইব। তোমরা দুঃখিত হইও না।

খোকন—আচ্ছা।

আমি—খোকন, একটা কথায় কিন্তু আমি খুবই দুঃখিত হইলাম। তুমি যে এত অসভ্য তা আমি কখনও জানিতাম না। তারানাথ তোমাদের খাবার খাইয়া যতই অন্যায় করিয়া থাকুক না কেন, তুমি যে তাকে 'তারা শালা' বলিয়াছ, বিশেষতঃ আমার সাক্ষাতে, ইহাতে আমি কিছুতেই আমার অসন্তোষ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। তুমি এরূপ করিতে পার তাহা আমার ধারণার অতীত ছিল। তুমি ভাবিতেছ এখন বাবা আমার কিছুই করিতে পারিবে না।

খোকন—না বাবা, আপনি জানেন না,—ও আমাকে খাইয়াছে। তাই আমার রাগ চাপিতে পারি নাই।

আমি—তোমাকে খাইয়াছে! তার মানে কি?

খোকন—ও-ই আমার মৃত্যুর কারণ। আমি ওকে দেখিয়া অসুখের আগে ডরাইয়াছিলাম।

আমি—কোথায় দেখিয়াছিলে?

খোকন—নীচে, কলতলায়।

আমি—কখন?

খোকন—সন্ধ্যার খানিক পরে।

আমি—আমাকে বল নাই কেন?

খোকন—ভয়ে।

আমি—কিসের ভয়?

খোকন—আপনার কাছে ধরা পড়িবার ভয়। আপনার কাছে বলিলে আপনি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করিতেন—কলতলায় রাত্রে একাকী গিয়াছিলে কেন? তাহা হইলেই আমি যে আপনার অজ্ঞাতে ফুটবল খেলিতে যাইতাম ও ধুলামাটি গায়ে মাখিয়া আসিতাম এবং তাহা ধুইতেই সন্ধ্যার পরে কলতলায় গিয়াছিলাম, তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িত। আপনি সন্ধ্যার আগে বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিতে বলিতেন তাহাও যে করি না, তাহা ধরা পড়িত।

আমি—আমি তো জানিতাম তুমি রোজ বিকালে বেড়াইতে যাও। তুমি কি আমার নিষেধ সত্ত্বেও রোজ ফুটবল খেলিতে?

খোকন—প্রায় প্রত্যহই খেলিতাম বাবা, আমি হ্যাফপ্যাণ্টের উপর কাপড় পরিয়া বেড়াইতে যাইবার ভান করিতাম। আপনি বুঝিতে পারিতেন না।

আমি—তোমার মা-কে বলিলে না কেন ?

খোকন—বৌমাকে বলিলেও সে আপনাকে না জানাইয়া কিছুই প্রতীকার করিতে পারিত না। শুধু শুধু কষ্ট পাইত। তাই তাকে বলি নাই।

আমি—বড়ই ভুল করিয়াছ। ভয় পাইয়াছ জানিলে তাহার প্রতীকার না করিয়া তোমাকে শাসন করিব একথা তুমি কেন ভাবিলে ?

খোকন—আমি বুঝিতে পারি নাই, বাবা।

আমি—আজ তবে যাও। আবার ডাকিব।

খোকন—অ চ্ছা।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বাড়ি না ছাড়িয়া বাড়ি হইতে ভূত ছাড়াইবার চেষ্টা করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। তদুপরি খোকন ও জামাতাকে আর একদিন খাবার দিতে অঙ্গীকার করিয়াছি কিন্তু সেদিনও যে তারানাথ আসিয়া আগে বসিয়া যাইবে না তার নিশ্চয়তা কি ? এই সব চিন্তা করিতে করিতে প্রথমেই পরম ভক্তিভাজন স্বর্গত অশ্বিনীবাবুর কথা মনে হইল। এবং এ বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইব স্থির করিলাম। কন্যাকে অশ্বিনী-বাবুর ছবি দেখিয়া তাঁহার আত্মা আনিতে বলিলাম। অশ্বিনী-বাবুর আত্মা আসিলে তাঁহার সঙ্গে নিম্নরূপ আলাপ আলোচনা হইল।

আমি—কে আপনি ?

অ-বাবু—অশ্বিনীকুমার দত্ত।

আমি—স্যার, আমাকে মনে আছে ?

অ-বাবু—সে কথা পরে হবে। আগে তারাকে তাড়াও।

[তিনি যে তারানাথের কথাই বলিতেছিলেন তাহা না বুঝিয়া প্রশ্ন করিলাম।]—

আমি—তারা কে ?

অ-বাবু—তারা প্রকাণ্ড ভূত। [দীর্ঘ-ঊ দিয়া ভূত লেখা হইল। কিন্তু আমরে ছেলে লিখিয়াছিল অন্যরূপ অথচ একই হাতে লেখা হইতেছে।]

আমি—কি করিয়া তাড়াইব ?

অ-বাবু—নাম কর।

আমি—কি নাম ?

অ-বাবু—'হরে কৃষ্ণ' নাম।

আমি—তারাকে দেখিয়া কি আপনার ভয় হয় ?

অ-বাবু—ভয় না, ঘৃণা।

আমি—কেন ?

অ-বাবু—অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

আমি—ওর চেহারাটা কেমন ?

অ-বাবু—বলিব না।

আমি—কেন স্যার ?

অ-বাবু—ছেলেপিলেরা ভয় পাইবে।

আমি—ওকি আপনাকে দেখিতে পায় ?

অ-বাবু—তা পায় না।

আমি—স্যার, আমরা কোন আত্মা আনিতে চেষ্টা করিলে প্রায়ই ও আসিয়া ওঠে।

অ-বাবু—আত্মা আনিবার সময় খুব নাম করিবে ; আর ছাতে না বসিয়া ঘরে বসিবে। অপবিত্র আত্মা (ভূত) ঘরে ঢুকিতে পারে না।

আমি—স্যার, আপনি কোথায় আছেন ?

অ-বাবু—এ স্থানের নাম অমরলোক।

আমি—উহা স্বর্গের কত নীচে ?

অ-বাবু—স্বর্গের অনেক উপরে।

আমি—কি করেন ওখানে ?

অ-বাবু—নাম করি, আলাপ আলোচনা করি।

আমি—জগদীশবাবু কোথায় ?

অ-বাবু—জগা এখানেই আছেন।

[আমার কন্যা 'জগা আছেন'—অশ্বিনীবাবুর এই বাক্যভঙ্গী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সে তাঁহাকে কখনো দেখেই নাই, জগদীশবাবুর নামও শোনে নাই।]

আমি—কালীশ পণ্ডিত মহাশয় ?

অ-বাবু—তার খোঁজ তো পাই না।

আমি—তিনি কি তবে জন্মগ্রহণ করিলেন ?

অ-বাবু—তা তো বলিতে পারি না।

আমি—আপনার স্ত্রী তো কিছুদিন আগে মরিয়াছেন, তিনি কি আপনার কাছে আছেন ?

[অশ্বিনীবাবু ইহলোকে স্ত্রী থাকিতেও ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন এবং বরাবর রাত্রিতে বাহির বাটীতে শয়ন করিতেন বলিয়া আমরা জানিতাম। পরলোকে কিরূপ ব্যবস্থা চলিতেছে জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়ায় এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম।]

অ-বাবু—এ স্থানে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই।

আমি—আমাকে কি করিতে উপদেশ দেন ?

অ-বাবু—নাম কর এবং সৎকাজ কর।

আমি—আমার বাবাকে তো আপনি চিনিতেন, তিনি কোথায় আছেন জানেন কি ?

অ-বাবু—তিনি এইখানেই আছেন।

আমি—তা কি করিয়া হয়? আপনি ও জগদীশবাবু নাম ডাকের সাধু, জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী! আর আমার বাবা মোটামুটি সৎ ও ধর্মপরায়ণ লোক হইলেও তাঁহাকে ব্যবসার খাতিরে মিথ্যা সাক্ষ্য শিখাইতে তো আমি প্রায় প্রত্যহই শুনিয়াছি। এ অবস্থায় আপনাদের গতি একরূপ কি করিয়া হইল?

অ-বাবু—তা বলিব না।

আমি—কেন বলিবেন না?

অ-বাবু—তাও বলিব না। [এই ঢংয়ের কথা বলা অশ্বিনী-বাবুর স্বভাবসিদ্ধ ছিল।]

আমি—তবে কি আপনাদের নিকটে ভুল শিক্ষা পাইয়াছিলাম? সত্যমিথ্যা সবই সমান? তবে কি জীবনটাকে আবার ঢালিয়া সাজিতে চেষ্টা করিব? নৌকায় উল্‌টা খোঁচ দিব?

অ-বাবু—তুমি যখন না শুনিয়া ছাড়িবে না তখন বলি শোন। তোমার বাবা নীচে অমরধামে আটকা পড়িয়াছিলেন। গয়ায় পিণ্ড দেওয়ার ফলে কিছু-দিন পূর্বে অমরলোকে আসিয়াছেন।

আমি—আর আপনারা?

অ-বাবু—আমাদের আর গয়ায় পিণ্ড দেবে কে? আমার তো ছেলে নাই। ভাইয়ের বেটারা তো সাহেব। আর জগদীশ তো বিবাহই করে নাই।

আমি—আপনারা তাহা হইলে নিজেদের জোরে ওখানে গিয়াছেন।

অ-বাবু—কর্মের ফলে বলাই উচিত।

আমি—আপনি দয়া করিয়া আমার বাড়িতে আসিলেন। এখন অনেক রাত্রি। দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কিছু খাইতে দিতে পারিলাম না। আর একদিন যদি অনুগ্রহ করিয়া আসেন তো—

অ-বাবু—তা হয় না। ওখানে তোমার পরিচিত আরও অনেকে আছেন, তাঁদের ফেলিয়া আসা যায় না।

[এ কথাগুলি তাঁর মত সামাজিক ও সদ্বিবেচক লোকেরই কথা।]

আমি—মোট কয়জন ?

অ-বাবু—সাত-আটজন হইবেন।

আমি—তাঁদের সুদ্ধ যদি নিমন্ত্রণ করি ?

অ-বাবু—তবে আসিতে পারি।

আমি—আপনি কোন খাদ্য পছন্দ করেন ?

অ-বাবু—একটি ডাব দিলেই চলিবে। [তখন গরমের দিন ছিল।]

আমি—আর জগদীশবাবুকে কি দিব ?

[কিছু সময় কোন লেখা পড়িল না। প্রায় দুই-মিনিট পরে উত্তর পাওয়া গেল। বোধ হইল যেন তিনি তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইলেন।]

অ-বাবু—তার পছন্দ আতা।

আমি—ওখানকার আত্মাদের রুচি তো আমি জানিনা। অন্যান্য যাঁরা আছেন তাঁদের জন্য কি আয়োজন করিব ?

অ-বাবু—সবার জন্যই ডাবের ব্যবস্থা করিও।

আমি—আমার বাবাকে দয়া করিয়া এখনই পাঠাইয়া দিবেন কি ?

অ-বাবু—সেটা ভাল দেখায় না। তুমিই তাঁহাকে ডাক। তাঁহার কাছে শুনিতে পাইবে 'তারা' তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছে।

[আমি বাবাকে ডাকিবার পূর্বে অশ্বিনীবাবুকে ডাকিয়াছি

একথা জানিলে বাবা পাছে মনঃক্ষুন্ন হন খুব সম্ভব এই জন্যই বোধহয় বাবাকে ডাকিয়া দিতে অস্বীকার করেন। 'ভাল দেখায় না'—কথাটার উহাই স্পষ্ট ইঙ্গিত। তাছাড়া অশ্বিনীবাবু যে বাবাকে ডাকিয়া দেওয়াটা নিজের মর্য্যাদার পক্ষে হানিজনক মনে করিবেন তা মনে হয় না। 'তারা তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছে' কথা দ্বারা বুঝিলাম বাবা অমরধামে থাকিতে খোকন তাঁহার কাছে মৃত্যুর কারণ বলিয়াছিল। এবং বাবা অমরলোকে গিয়া অশ্বিনীবাবুর সংগে আমার সম্বন্ধীয় কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে উহা বলিয়াছেন। অথচ খোকন এমন ছেলে যে সে জীবিত থাকিতে ভূত দেখিবার কথা তো বেমালুম গোপন করিয়াছিল। মৃত্যুর পরেও সহজে সেকথা আমার নিকট প্রকাশ করে নাই, পাছে আমরা মনে কষ্ট পাই এই ভাবিয়া। পরে যখন 'তারা শালা' বলার জন্য আমি অনুযোগ করিলাম তখন আত্মসমর্থন করিতে গিয়া তার প্রতি রাগের কারণ স্বরূপ ঐ ঘটনা বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

[অশ্বিনীবাবু অবশ্য জানিতেন না যে তারানাথের কুকাণ্ড আমি আগেই খোকনের কাছে শুনিয়াছিলাম। তাই তিনি নিজে ঐ দুঃখজনক সংবাদটা না দিয়া বাবার নিকট উহা শুনিতে বলিলেন। আমি প্লানচেটের ব্যাপারটা বরাবরই খানিকটা সন্দেহের চোখে দেখিতেছিলাম। তাই বিভিন্ন কথার মধ্যে অসামঞ্জস্য বাহির করিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলাম। কিন্তু এইসব কথাবার্তা এত স্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হইতেছিল যে, ক্রমে জোর করিয়াও আর সন্দেহের ভাব রক্ষা করিতে পারিতে ছিলাম না।]

আমি—খোকন, আজ যে তোমাদের খাবার দেওয়া হইয়াছিল
তাহা পাইয়াছ তো ?

খোকন—হাঁ বাবা আজ পাইয়াছি।

আমি—জামাইবাবু ?

খোকন—তিনিও পাইয়াছেন।

আমি—আজ খাবার দিয়া খুব নাম চালাইয়াছিলাম তাই
'তারা' আসিতে পারে নাই। প্লানচেট ধরিয়াও নাম
করা হয় তাই সে প্লানচেটে আসিতে পারে নাই।
অশ্বিনীবাবুর পরামর্শে তারাকে খুব জব্দ করিয়াছি।

খোকন—আপনারা সবাই তুলসীর মালা গলায় পরুন।

আমি—তা আমি পারিব না। ওরূপ করিয়া ভক্ত সাজিতে
আমার আপত্তি আছে।

খোকন—তবে হাতে মালা পরুন।

আমি—তা বরং পারিব, তাতে আপত্তি নাই। উহা জামার
নীচে থাকে। কিন্তু গলার মালা ঢাকিয়া রাখা সম্ভব
না।

খোকন—নাম করিলে এবং মালা হাতে পরিলে তবে আর
এ বাড়ি না ছাড়িয়াও পারেন। 'তারা' কিছুই করিতে
পারিবে না।

আমি—আচ্ছা খোকন তুমি সেদিন বলিয়াছ তোমার ও স্থানের
নাম অমরধাম। ওটা কোথায় ?

খোকন—কোথায় বলা শক্ত। তবে স্বর্গের নীচে একথা
শুনিয়াছি।

আমি—মরার পরে কারা অমরধামে যায় ?

খোকন—অল্প পাপীরা।

আমি—তারানাথ যেখানে আছে ওখানে কারা থাকে ?

খোকন—মহাপাপীরা।

আমি—অমরলোকের নাম শুনিয়াছ ?

খোকন—হ্যাঁ, শুনিয়াছি। ঠাকুরদাদা সেখানে আছেন।

আমি—অমরলোকে কারা থাকে ?

খোকন—পাপমুক্তরা

আমি—তারানাথদের ও তোমাদের স্থানের মধ্যে আর কোন স্থান আছে কি ?

খোকন—একটা স্থান আছে। অমরস্তর।

আমি—সেখানে কারা যায় ?

খোকন—পাপীরা।

আমি—সেখানকার খবর তুমি রাখ ?

খোকন—হাঁ, আমরা নীচের খবর জানিতে পারি। উপরের খবর জানিতে পারি না।

আমি—অমরস্তরে আছে এমন কোন লোকের নাম করিতে পার ?

খোকন—হাঁ পারি। বড় পিসামহাশয়।

আমি—রুনু কোথায় বলিতে পার ?

[রুনু আমার দ্বিতীয় দৌহিত্র ছিল।]

খোকন—না।

আমি—তুমি ওখানে গিয়া প্রথমে কার সঙ্গে ছিলে ?

খোকন—ঠাকুরদাদার সঙ্গে।

আমি—তাঁর সঙ্গে প্রথমে কোথায় দেখা হইল ?

খোকন—আমার মরার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন।

[খোকন মৃত্যুর কিছু পূর্বে প্রলাপে বলিয়াছিল—ঐ যে ঠাকুরদাদা আসিয়াছেন।]

আমি—তার পরে ?

খোকন—তারপর অনেকদিন পরে ঠাকুরদাদা একদিন আমাকে বলিলেন,—খোকন, এবার আমাকে এখান হইতে যাইতে হইবে। তুমি এখানে থাক, আমি চলিলাম। আমি কাঁদিলাম। তিনি বলিলেন—আমার না যাইয়া উপায় নাই। তোমাকেও নিয়া যাইবার সাধ্য নাই।

আমি—তুমি জিজ্ঞাসা করিলেনা কোথায় এবং কেন যাইতেছেন ?

খোকন—হাঁ, তিনি বলিলেন মুক্তি পাইয়া এখান হইতে উর্ধ্ব-লোকে—অমরলোকে যাইতেছি। সেজকাকা নাকি গয়ায় পিণ্ড দিয়া গিয়াছে।

আমি—কি! মৃত্যু সময়ে সে তোমাকে দেখিতে আসিল না! মৃত্যুর পরেও সরিকী! গয়ায় গিয়া বাবার পিণ্ড দিল আর তোমার পিণ্ড দিল না!

খোকন—বাবা, আপনি রাগ করিবেন না। সেজকাকা বুঝতে পারে নাই যে ছেলেপিলেরও পিন্ড দিতে হয়।

আমি—তুমি তোমার সেজকাকার পক্ষে যতই ওকালতী কর না কেন আমি যা বুঝিয়াছি ঠিকই বুঝিয়াছি। যাক, আমি শীঘ্রই গয়ায় গিয়া তোমার ও তোমার জামাই-বাবুর পিন্ড দিব।

খোকন—পিন্ড দিলে আমরা ঠাকুরদাদা যেখানে গিয়াছেন সেইখানে যাইতে পারিব।

আমি—ঠাকুরদাদা চলিয়া যাইবার পর তুমি কার সঙ্গে ছিলে ?

খোকন—জামাইবাবু এখানে আসা পর্যন্ত একাকী ছিলাম।

আমি—তোমার তখন খুব কষ্ট ও অসুবিধা হইত নিশ্চয় ?

খোকন—নিজের কোন লোক ছিল না সত্য, কিন্তু একেবারে

একাকী ছিলাম না। এখানকার পরিচিত কয়েকজনার সঙ্গে থাকিতাম।

আমি—কি করিয়া সময় কাটাইতে এবং এখন কাটাও ?

খোকন—খেলিয়া, বেড়াইয়া এবং গান করিয়া।

আমি—কোন কোন গান করিয়া থাক ?

খোকন—সুন্দর লালা শচীর দুলালা
নাচত শ্রীহরি কীর্তনমে—

*　　*　　*

আমার প্রেমের হরি
প্রেমে গড়া তার এ জগৎখানি—

*　　*　　*

এসেছে ব্রজের বাঁকা
কাল সখা দেখবি আয়।
ও তার রং ফিরেছে ঢং ফিরেছে
কাল এবার গৌর হয়েছে
এবার দেখে চেনা দায় !

[জীবিতসময়ে চার-পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই খোকন মিষ্টি-সুরে এই গানগুলি গাইত।]

আমি—জামাইবাবুর সঙ্গে কিভাবে দেখা হইল ?

খোকন—তিনিই আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে আছি।

আমি—প্রলাপের মধ্যে তুমি নাকি বলিয়াছিলে—বাবা কোথায় ? তাঁহাকে একটা কথা বলিতাম। আমি তখন কাছে ছিলাম না। পরে ঐ কথা শুনিয়া তোমাকে অনেক ডাকাডাকি করিয়াও কোন সাড়া পাই নাই। আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম তুমি আমাকে কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে ?

খোকন—ঐ টাকার কথা। টাকা নাই—

আমি—থাক, আর লিখিতে হইবে না। আমি সব বুঝিয়া গিয়াছি।

[এই বিষয়টা আমার পক্ষে একটা মর্মান্তিক যন্ত্রনাদায়ক ব্যাপার। আমি খোকন এবং আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেহই ইহা জানিত না। খোকনের মৃত্যুতে যে আমি অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছিলাম তার চৌদ্দ আনা কারণ ছিল এই ব্যাপারটা।] আচ্ছা খোকন, তুমি কেন মরিলে কিছু বলিতে পার কি ?

খোকন—আপনার মঙ্গলের জন্য।

আমি—বুঝিনা তোমার মৃত্যুতে আমার কি মঙ্গল হইতে পারে। তবে 'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য' এই কথা বলিয়া যদি আমাকে প্রবোধ দিতে চাও, সে স্বতন্ত্র কথা। যাক ও কথা। বলতো খোকন নরক আছে কি না।

খোকন—না নরক নাই। ভুল বলিয়াছি বাবা নরক আছে।

আমি—ভুলটা হঠাৎ শোধরাইয়া দিল কে ?

খোকন—জামাইবাবু।

[বুঝিলাম নরক থাকুক কি নাই থাকুক জামাতা চায় না যে তার অল্প বয়স্কা বিধবা স্ত্রীর মন হইতে নরকের ভয়টা চলিয়া যায়। অথবা এরূপও হইতে পারে যে খোকন যে স্তরে আছে তথায় নরক নাই কিন্তু জামাতা হয়তো নীচের স্তরগুলি অনুসন্ধানে জানিয়াছে যে নরক আছে। আর তারানাথ তো নরকই ভোগ করিতেছে বলা যায়।]

আমি—আপনি কে ?

পিতাঠাকুর—রাধাচরণ চক্রবর্তী।

ননী—ঠাকুরদাদা, আপনি এমন একটা কিছু লিখুন যাতে বাবার ও আমাদের মনে খাঁটি বিশ্বাস জন্মে যে আপনিই আসিয়াছেন। বাবা এখনও মাঝে মাঝে আমাকে বলেন, 'কি উত্তর হইবে আগে তা চিন্তা করিস না তো ?'

পিতাঠাকুর—আমার একটা হার ছিল সেটা—[ননী বলিল ঠাকুরদাদা একটা হারের কথা বলিতেছেন। ঠাকুরমায়ের গলায় কোন হারানো হারের সন্ধান হয়তো বলিবেন। তাঁর কোন হার হারানো গিয়াছিল কি ? আমি বলিলাম—সেরূপ কিছু ঘটে নাই আমি ঠিক জানি। এই কথা বলিতে বলিতে আমি প্লানচেটটি সরাইয়া আনিয়া পুনরায় লিখিবার জন্য যথাস্থানে স্থাপন করিলাম।]

আমি—ঠিক করিয়া লিখুন কি লিখতে চান।

পিতাঠাকুর—আমার গায়ের একটা হার ছিল। উহা পিরোজপুরে বেল তলায় পুতিয়া রাখিয়া উপরে একটি মন্দির করিতে বলিয়াছিলাম। তাহা করা হয় নাই কেন ? [পূর্ববঙ্গের উচ্চারণানুযায়ী 'হাড়'কে 'হার' লিখিয়া বাবা এই গোলমাল ঘটাইয়াছিলেন কিন্তু এই ভুলের মধ্য দিয়াও আসল ব্যাপারের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ আমার কন্যা ননী ছেলেবেলা হইতে কলিকাতায় আছে। সে 'হার' অর্থে 'গলার হার' মনে করিতেছে। অথচ বাবা ননীকে গলার হার বুঝিয়া ভুল করিতে দেখিয়া 'গায়ের হার' (অর্থাৎ হাড়) লিখাইয়া ননীর ভুল

সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই উত্তরটি খুবই অদ্ভুত। ঘটনাচক্রে ইহা ননীর প্রশ্নের খাঁটি জবাবও হইয়াছে। কারণ বিষয়টি তার ও তার মার এবং আমারও অজানা। সুতরাং তাদের চিন্তার ফল হইতেই পারে না। অধিকন্তু যা লেখা হইয়াছে ননী তার প্রকৃত অর্থ বুঝিতেই পারে নাই।]

আমি—আমি তো কিছু জানিনা।

পিতাঠাকুর—তুমি না জানিতে পার, কিন্তু উহারা জানে।

[বাবা এই 'উহারা'-দ্বারা মাকে বুঝাইয়াছেন। বাবা মাকে বুঝাইতে হইলে বলিতেন 'ঘরের ওরা'। এই ওরাই লিখিত ভাষায় 'উহারা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে নিশ্চয়। প্লানচেট ধরিবার সময়ে মা আমার কাছে ছিলেন না। পরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম কথাটা সত্য। বাবার পূর্ব নির্দেশানুসারে মৃত্যুর পরে মায়ের কথানুযায়ী আমার সেজ ভাই নরেশ শ্মশান হইতে একখানা অস্থি আনিয়াছিল। কিন্তু আমাকে না জানানোর ফলে বাবার আদেশ অনুযায়ী কোন কাজই হয় নাই। পরে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে আমি কিছু মানিনা বলিয়া আমাকে ওকথা জানানো হয় নাই।]

আমি—বাবা, ওখানে আপনি কি করেন ?

পিতাঠাকুর—নাম করি।

আমি—কি নাম ?

পিতাঠাকুর—গুরুদত্ত নামও করি, হরিনামও করি।

[বাবা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা পাইয়াছিলেন।]

আমি—শ্রাদ্ধ সময়ে আপনার সংস্কারে বাধে এরূপ কিছু ঘটিয়া ছিল কি ?

পিতাঠাকুর—হাঁ, ঘটিয়াছিল।

আমি—তবে তো শ্রাদ্ধক্রিয়া পণ্ড হইয়াছিল। আপনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

পিতাঠাকুর—না সবই পাইয়াছি। এখানে ওসব বাছ-বিচার নাই।

আমি—'এখানে' কোথায় ? গঙ্গাতীরে ?

পিতাঠাকুর—না, পরলোকে।

[বাবা অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। তাঁহার সংস্কার-বিরোধী যে অশুচিতা গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধঘাটে ঘটিয়াছিল তা শোধরানো তখন একরূপ অসাধ্যই ছিল। তাই আমি উহা চাপিয়া গিয়াছিলাম। নতুবা মাতাঠাকুরানী হয়তো গোলমাল করিতেন। ব্যাপারটি আর কাহারও চোখেই পড়ে নাই। এবং আমিও মায়ের ভয়ে ঘূণাক্ষরে কাহারো কাছে প্রকাশ করি নাই। এরূপ কথা প্লানচেটে লিখিত হওয়ায় প্লানচেট ব্যাপারটার সত্যতা প্রমাণিত হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শ্রাদ্ধঘাটে যখন পিণ্ড মাখা হইতেছে সেই সময়ে একজন মুসলমান একখানা বৈঠা রাখিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।]

আমি—ওখানে কি মুসলমান দেখেন ?

পিতাঠাকুর—হাঁ, মুসলমান আছে।

আমি—ওখানে আর কে কে আছেন আমার পরিচিত ?

পিতাঠাকুর—দাদা, ছোড়দাদা, কামিনী কবিরাজ, অম্বিকা দাস—

আমি—(বাধা দিয়া) অম্বিকাবাবু আছেন ! সে কি ? তিনি তো বদ্ধ মাতাল ছিলেন। গাঁজাও নাকি খাইতেন। বাসার পাকের বামুনকে বলিতেন, তুই বামুন তাই জুতাপেটা করা যায় না। রাখ, হরিণের চামড়ার জুতা তৈরি করিয়া তোকে জুতা মারিব। এরূপ দুর্দান্ত লোক ওখানে গেলেন কি করিয়া ?

পিতাঠাকুর—তুমি ওকথা বলিতে পার না। তাহার অন্তঃকরণ অতি উদার ছিল। গাঁজা খাওয়া শিখিয়াছিল এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়া। বাহিরের লোকে ঐ

গাঁজা খাওয়াটাই দেখিয়াছে, সাধুর প্রতি টানটুকু সাধুসঙ্গের আভ্যন্তরীণ কাজটুকু দেখে নাই। আরও এক কথা। তাহার মৃত্যু হইয়াছে প্রায় ৩০ বৎসর আগে। এতদিন সাধনা করিয়াও কি সে এখানে আসিবার উপযুক্ত হইতে পারে না ?

[অম্বিকা দাসের মৃত্যু হইয়াছিল ১৯০৭ কি ১৯০৮ সনে। আর আত্মা আনা হইয়াছিল ১৯৩৬ সনে। সুতরাং প্রায় ৩০ বৎসর কথাটা ঠিক্। আমার কন্যা ননীর জন্ম হয় ১৯০৭ সনে। অম্বিকাবাবুকে সে দেখে নাই বা তাঁহার বিষয়ে কোন কিছু শোনেও নাই। আমিই পরে হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, ১৯০৭ কি ১৯০৮ সনে তিনি মারা যান। সুতরাং ৩০ বৎসর আগে তাঁহার মৃত্যু হওয়ার কথাটা খুবই সত্য।]

আমি—আর কেউ আছে ?

পিতাঠাকুর—আর আছে অশ্বিনী দত্ত।

[বাবার কাছে শুনিয়াছি তিনি ও অশ্বিনীবাবু ছেলেবেলায় দৌলত খাঁ মাইনর স্কুলে পড়িতেন। বাবা উঁচু ক্লাসে এবং অশ্বিনীবাবু নীচে পড়িতেন। তাই বোধহয় 'আছেন অশ্বিনীবাবু' না লিখিয়া 'আছে অশ্বিনী দত্ত' লিখিয়াছেন। সম্ভ্রমসূচক ন-কারের ব্যবহার পূর্ববঙ্গে বিরল।]

আমি—আর কে আছে ?

পিতাঠাকুর—আর আছে জগদীশ বা—

আমি—(প্লানচেট সরাইয়া রাখিয়া) জগদীশবাবুর কথা জানি। আর কে ?

পিতাঠাকুর—জগদীশ বারৈ।

আমি—সে আবার কে ?

পিতাঠাকুর—ঐ যে কদমতলার ছেলেটি তোমার কাছে আসিত।

আমি—জগদীশ দাস ? সে তো বারৈ (বারুই) না, কায়স্থ।

পিতাঠাকুর—তা হবে।

আমি—তার বাড়িও কদমতলায় না, খুলনা জিলায়। কদমতলা স্কুলে পড়িত। কদমতলা বারুই প্রধান স্থান বলিয়া বোধহয় আপনি তাকে বারৈ মনে করিয়াছেন।

পিতাঠাকুর—আমি তাকে বারৈ বলিয়াই জানিতাম।

[বারুইর বারৈ বানানটা বরিশালে প্রচলিত থাকিলেও আমার কন্যা ছেলেবেলা হইতে কলিকাতায় থাকার ফলে 'বারৈ' বানান তাহার জানা নাই। তাছাড়া জগদীশ যে কায়স্থ তা সে ভাল ভাবেই জানিত। কারণ আমরা কলিকাতায় আসিবার কিছু পরেই জগদীশ কলিকাতায় আসে এবং মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত প্রায় প্রত্যহই আমার বাসায় আসিত। সে আমার স্ত্রীকে আমার পুত্র খোকনের মত বৌ-মা ডাকিত। বাবার আর একটা স্বভাব ছিল তিনি নীচ জাতির লোকদের পদবী না ধরিয়া জাতি ধরিয়া নাম বলিতেন; যেমন—ভারত নম, ভগা নাপিত, মহাভারত যুগী (যোগী), উমা বারৈ ইত্যাদি]

আমি—আপনি যেখানে আছেন উহা তো স্বর্গের উপরে, অশ্বিনীবাবু বলিয়াছেন। তবে আর বেলতলায় অস্থি পুতিয়া মন্দির করার আবশ্যকতা কি ?

পিতাঠাকুর—আকাঙখার নিবৃত্তি।

আমি—আমাকে আর কিছু বলিবেন ?

পিতাঠাকুর—তোমার মাকে আনিয়া তোমার কাছে রাখ।

আমি—আপনি তো সব ব্যাপারই জানিতে পারিয়াছেন।

পিতাঠাকুর—হুঁ, তা সবই জানি। তথাপি সব ভুলিয়া গিয়া তাকে আনিয়া তোমার কাছে রাখ। তুমি বড়, তাছাড়া ওখানে তাহার অসুবিধাও হইতেছে।

আমি—অসুবিধা হইতেছে জানিয়া আমি তাঁহাকে ওকথা

বলিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি সুরেশের ছেলেমেয়ের মায়া কাটাইয়া আমার কাছে আসিতে রাজি হন নাই।

পিতাঠাকুর—তুমি আবার আমার নাম করিয়া বল, খুব সম্ভব এখন আসিবে।

আমি—তা আমি বলিব, কিন্তু তাতেও যদি না আসেন?

পিতাঠাকুর—না আসিলে তুমি আর কি করিবে? সে নিজেই ভুগিবে।

ননী—ঠাকুরদাদা, আপনি আমাদের দেখা দিতে পারেন?

পিতাঠাকুর—চেষ্টা করিলে বোধ হয় পারি। কিন্তু তা করা উচিত না। তোমরা ভয় পাইবে।

আমি—অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে আপনার কোন কথাবার্তা হইয়াছে কি?

পিতাঠাকুর—হাঁ, হইয়াছে—তোমার সম্বন্ধীয় কথা। খোকনের মৃত্যুর কথা। খোকনের ভূত দেখিয়া ভয় পাইবার কথা আমি তাকে বলিয়াছি।

আমি—আমার সম্বন্ধে তিনি কি বলিলেন?

পিতাঠাকুর—তোমার প্রশংসাই করিলেন। সেকথা তোমার না শোনাই ভাল।

আমি—সুশীলা (আমার ভগ্নী) কোথায় আছে?

পিতাঠাকুর—তা বলিব না।

আমি—আপনি না বলিলেও আমি বুঝিতে পারিয়াছি সে খুব কষ্টে আছে।

পিতাঠাকুর—ঠিকই বুঝিয়াছ।

আমি—সুশীলা তো খুব ভাল মেয়ে ছিল। তার এরূপ অবস্থা কেন হইল?

পিতাঠাকুর—অশুচী অবস্থায় (আঁতুড়ে) তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

আমি—তাতে তাহার অপরাধ কি? সেজন্য সে বেচারা শাস্তি পাইবে কেন?

পিতাঠাকুর—মূল অপরাধ পূর্বকর্ম। তার ফলে ওরূপ অপমৃত্যু, তার ফলে অধোগতি। লোকে পূর্বকর্ম দেখিতে পায় না, অপমৃত্যুটা দেখে। সুতরাং ঐটাকেই মূল কারণ মনে করিয়া থাকে।

আমি—তবে কি জ্যেঠাইমা, ছোট মামী প্রভৃতি যাঁহারা প্রসবকালে মরিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকেরই ঐরূপ অধোগতি হইয়াছে?

পিতাঠাকুর—হাঁ?

আমি—আমি শীঘ্রই টম-কে লইয়া গয়ায় যাইতেছি খোকনের ও হীরালালের পিণ্ড দিবার জন্য। ঐ সময়ে সুশীলারও পিণ্ড দিব। তাতে কি সে মুক্তি পাইবে না?

পিতাঠাকুর—বিশেষ কিছু কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে দিয়া দেখিতে পার।

আমি—আমি অশ্বিনীবাবুর নিকট বলিয়াছি ওখানে আমার জানা যেসব আত্মা আছেন তাঁহাদের একদিন ভোজ দিব।

পিতাঠাকুর—ভালই।

আমি—আপনি যাঁহাদের নাম করিয়াছেন তাঁহাদের ছাড়া আর কেহ এমন আছেন কিনা যাহাকে নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে?

পিতাঠাকুর—হাঁ, সি. আর. দাস।

আমি—তিনি তো আমাকে চিনিতেন না। তাঁহাকে বলিলে কি তিনি আসিবেন? আর জ্যেঠামহাশয় কি বিলাত ফেরৎ ও ব্রাহ্মের সঙ্গে বসিয়া খাইবেন?

পিতাঠাকুর—অশ্বিনী দত্ত তাঁহার কাছে তোমার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছে এবং আমারও পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। সুতরাং তুমি নিমন্ত্রণ করিলে যাইবে। দাদারও খাইতে আপত্তি হইবে না। [জ্যেঠা-মহাশয় ন্যায়রত্ন উপাধিধারী গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন !]

হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি—কে আসিয়াছ ?

হীরালাল—হীরালাল। ও হাসে কেন ?

আমি—তুমি চারু চন্দ কে চিনিতে ?

হীরালাল—হাঁ।

আমি—দেখনা, সে কেমন ভঙ্গী করিয়া হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নাচিতেছে আর নাম করিতেছে, তাই দেখিয়া ননী হাসিয়া ফেলিয়াছে।

হীরালাল—ও !

[তারানাথের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অর্থাৎ সে যাহাতে আগেই প্লানচেট দখল করিয়া বসিতে না পারে তজ্জন্য অশ্বিনীবাবুর উপদেশানুযায়ী একজন না একজন উচ্চকণ্ঠে নামগান করিত। আমি এইদিন চারুকে নাম করিতে বলিয়া-ছিলাম। প্লানচেট ধরিবার পূর্ব হইতেই চারু নাম করিতেছিল। প্লানচেট নড়িবামাত্র চারু হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভঙ্গী করিয়া হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। ননী তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু আমার জামাতা হীরালালের নিকট ননীর এই ব্যবহার বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল মনে

করি। জামাতার নিকট ওরূপ বোধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। জামাতা তো আর সশরীরে আসে নাই; ইহাতে ননীর হাসির কোন কারণ ছিল না। আর যদি কারণ থাকিতও তবু তার আগমনে আমার সাক্ষাতে হাসিয়া ফেলা ননীর পক্ষে বেয়াদবী হইত। যে হাসিল তার হাতেই লেখা পড়িল 'ও হাসে কেন?' কোনরূপ কৃত্রিমতা থাকিলে কিছুতেই এরূপ ঘটিতে পারিত না।

আমি—হীরালাল, তুমি কেমন আছ?

হীরালাল—বিশেষ ভাল না।

আমি—কেন? পিণ্ড দেওয়া হয় নাই বলিয়া?

হীরালাল—হাঁ, গয়ায় পিণ্ড দেওয়াইতে পারিলে ভাল হয়।

আমি—আমি শীঘ্রই টমকে (টম সেই ভুনু) নিয়া গয়ায় যাইব।

হীরালাল—ভুনু যেন আমার প্রতিনিধিরূপে আমার ঠাকুর-মাকে পিণ্ড দেয়। তিনি আমাকে ছেলেবেলা পিতৃবিয়োগের পর সযত্নে পালন করিয়াছিলেন। আমাকে তিনি খুবই ভালবাসিতেন। ভুনু তাকে ২টি পিণ্ড দিবে—ভুনুর নিজের অধিকারে একটি আর আমার প্রতিনিধি স্বরূপ একটি।

আমি—তা দেওয়াইব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আচ্ছা তোমার কাছে খোকন ছাড়া আর কেহ থাকে কি?

হীরালাল—হাঁ, থাকে।

আমি—কে থাকে?

হীরালাল—ভুনুর মা।

আমি—সে কি! ভুনুর মা তো ননী। সে তো প্লানচেট ধরিয়াছে। এখানে এখন সে তোমার কাছে আছে বটে কিন্তু আমি তো তা জিজ্ঞাসা করি নাই। ঐ লোকে তোমার কাছে আর কে থাকে তাহাই জানিতে চাহিয়াছি।

হীরালাল—আমিও তাহাই বলিয়াছি—ভুনুর আগের মা—
রমার মা চারু।
[রমা আমার জামাতার প্রথম পক্ষের কন্যা।]

আমি—ও! চারু এখন কোথায়?

হীরালাল—এই যে কাছেই দাঁড়াইয়া আছে!

আমি—খোকন?

হীরালাল—সেও এখানেই দাঁড়াইয়া আছে।

আমি—এখানে আর কে দাঁড়াইয়া আছে?

হীরালাল—প্রফুল্ল।

আমি—সে আবার কে?

হীরালাল—তারক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছেলে পোরগোলার।

আমি—ও! পোটক! সে তো তোমার মাসতুত বোন বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি।

হীরালাল—হাঁ।

আমি—তোমরা তো বেশ দল বাঁধিয়া আছ! এদিকে যেমন একদল ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছে, ওদিকে তেমনি আর একদলকে পাইয়াছ। এসব জানিতে পারি'ল আমাদেরও কষ্টের অনেকটা লাঘব হয়। আর মৃত্যু-ভয়ও কমিয়া যায়। আর কিছু বলিবে?

হীরালাল—আমি আপনাকে ভুল বুঝিয়াছিলাম। সে জন্য খুবই অনুতপ্ত। ক্ষমা চাহিতেছি।

আমি—ক্ষমা আমি তোমাকে গোড়াতেই করিয়াছিলাম।

হীরালাল—ভুনুকে একটু ডাকুন। তাকে কয়েকটা কথা বলিব। [ভুনুকে ডাকিয়া আনা হইল।] ভুনু, আমি নিজে তোমারই মত আট বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া নানারূপ বাধা-বিঘ্ন অসুবিধার মধ্যে মানুষ হইয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল তোমাকে

অপেক্ষাকৃত সুখে রাখিয়া মানুষ করিব। কিন্তু আমারও দুর্ভাগ্য তোমারও দুর্ভাগ্য—তুমিও আট বৎসর বয়সেই পিতৃহীন হইয়াছ। তবে তোমরা কোনরূপ অসুবিধাই ভোগ করিতেছ না। তোমার দাদাবাবু [আমাকে আমার নাতি-নাতনীরা দাদাবাবু ডাকিত। বর্তমানে দাদু বলিয়া ডাকে] তোমাদের যত্নেই পালন করিতেছেন। তাঁহার কথার অবাধ্য হইবে না। মানুষ হইতে চেষ্টা করিবে। আমার রসগোল্লা মেয়েটাকে একটু দেখিব। [নাতনী খুকুকে আনা হইল]

আমি—খুকুকে কিছু বলিবে ?

হীরালাল—না। আমার পানতুয়া ছেলেটাকে একটু দেখিব। [ভুনুর ছোট ভাই আমার ছোট নাতি চন্দুকে আনা হইল। ফর্সা এবং নরম বলিয়া জামাতা খুকুকে রসগোল্লা বলিত আর কালো ও শক্ত বলিয়া চন্দুকে পানতুয়া বলিত। জামাতার মৃত্যুদিনে চন্দুর ঠিক এক বৎসর পূর্ণ হয়। খুকু তখন আড়াই বৎসরের ছিল। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার জামাতার পরিবারে তিনপুরুষ পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে ঘটিয়া আসিয়াছে। ছেলের বয়স আট বৎসর হইতে বাবার মৃত্যু ঘটিয়াছে। হীরালালের পিতাও আট বৎসর বয়সেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন।]

আমি—তোমার ঠাকুরমার পিণ্ড দিতে বলিয়াছ। ননী তাঁহার নাম জানে না। তাঁহার নাম কী ছিল ?

হীরালাল—অঘোরমণি দেবী।

ইহার পর ননী প্লানচেট ধরিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনে মনে

প্রশ্ন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তাহার চক্ষু হইতে অবিরল জল পড়িতেছিল। আমি ও তাহার মা অনেক বলায় সে কিছু সময় প্লানচেট ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু খানিক পরে আবার উহাতে হাত দিবামাত্র উহা নড়িয়া ওঠে এবং লেখা পড়িতে থাকে। ননীর তখনকার ভাব দেখিয়া আমরা উভয়েই বিশেষ কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম। এই রূপে প্রায় আধ ঘন্টা প্লানচেট চালাইয়া আমাদের একান্ত পীড়াপীড়িতে সে উহা রাখিয়া দেয়। সে মনে মনে কি কি প্রশ্ন করিয়াছিল এবং কি কি উত্তর পাইয়াছিল তাহা জানিবার জন্য আমরা কোন চেষ্টা করি নাই। তবে বুঝিয়াছিলাম, জামাতা ও ননী কেহ কাহারো সঙ্গ ছাড়িতে চাহিতেছিল না। আর বুঝিয়াছিলাম, আত্মারা মনের কথাও বুঝিয়া তার উত্তর দিতে পারে।

আমি পূর্বে বলিয়াছি আগাগোড়া এ ব্যাপারে আমি সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিয়াছি। যতই ইহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ পাইতেছিলাম ততই নূতন নূতন ভাবে ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছি। জামাতা তাহার ঠাকুরমার যে নাম লিখিয়াছে তাহা কতদূর সত্য পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার মাতার নিকট পত্র লিখিয়া তাঁহার শাশুড়ীর নাম জানিতে চাই। তিনি লিখিলেন 'আদরমণি' অথচ জামাতা প্লানচেটে জানাইয়াছিল 'অঘোরমণি'। আমার মনে হইল প্লানচেটে যেমন পেনসিল না তুলিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া অক্ষরগুলি লেখা হয় তাহাতে আদরমণির 'অ'-এর আ-কারটাকে 'ঘ'-এর এ-কার মনে করিলে আর 'দ'-এর পায়ের নীচের অংশকে 'র'-এর সঙ্গে মিশাইয়া দিলে আদরমণিকেই অঘেরমণি পড়া খুবই স্বাভাবিক। অঘেরমণি নাম থাকে না, তাই অঘোরমণি হইবে মনে করাও অতি স্বাভাবিক। তাছাড়া আদরমণি অপেক্ষা অঘোরমণি নামটাই ভদ্র পরিবারের অধিক উপযোগী। প্লানচেটে যখন লেখা হইত তখন

আমি আগাগোড়াই উহার নীচে উঁকি মারিয়া শব্দগুলি সশব্দে পড়িয়া যাইতাম। 'অঘের' লেখা দেখিয়া অনুমানে 'অঘোর' পড়িয়াছিলাম কিনা তাহা আমার মনে নাই। পরে চিন্তা করিয়া ওরূপ হইতে পারে বলিয়া মনে করিয়াছি।

আমার পূর্বোক্তরূপ অনুমান ঠিক কিনা তাহাও বাজাইয়া লইতে মনস্থ করিলাম। ননী দ্বারা পুনরায় প্লানচেট ধরাইয়া জামাতার আত্মা আনিয়া লেখাটা হুঁসিয়ার ভাবে দেখিয়া লইলে চলিতে পারিত। কিন্তু বৈবাহিকার লিখিত কার্ড ননীর হাতেই আসিয়া পড়ে। সুতরাং এখন যদি আদরমণি বা অঘেরমণি লেখা পড়ে তাহাতে আমার সন্দেহ দূর হইবে না। তাই ননী যাহার নিকট প্লানচেট আনা শিখিয়াছিল তাহার সন্ধানে বাহির হইলাম। মনে হইল সে জামাতার স্বগ্রামবাসী হইলেও তাহার ঠাকুরমার নাম সে কিছুতেই জানিতে পারে না। কারণ একে তিনি ভিন্নগ্রামবাসী স্ত্রীলোক, তদুপরি ঐ ভদ্রলোকের জন্মের পূর্বে না হউক অন্ততঃ তাহার বালক বয়সে সে বৃদ্ধার মৃত্যু হইয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি বানাড়িপাড়ায় থাকিতেনও না। তিনি থাকিতেন তাঁহার বাপের বাড়ি কাফুরকাঠি গ্রামে। আমার জামাতা হীরালাল ছেলেবেলা সেখানেই থাকিত।

সে লোকটিকে পাইলাম না কিন্তু পাইলাম তাহার ভাই দীনেশ কে। দীনেশ একদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় আসিল এবং অপর একটি যুবককে সঙ্গে করিয়া আনিল। এই যুবক আমার জামাতাকে দেখে নাই। দীনেশ ও সেই যুবকটি প্লানচেটে হাত রাখিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তি চক্ষু বুজিয়া জামাতার মুখ ভাবিতে লাগিল আর সঙ্গের যুবকটি জামাতার এন্‌লার্জ করা ফটোর দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে প্লানচেট নড়িয়া উঠিল। আমি 'কে আসিয়াছ' বলিয়া দুই-তিন বার প্রশ্ন করিলাম। কিন্তু কোন সাড়া পাইলাম না। পরে যাহা ঘটিল তাহা বিশেষ কৌতূহলজনক।

STEPHENSON

প্রঃ—কে ? হীরালাল ?

উঃ— I have come.

প্রঃ—Who are you ?

উঃ—My name is Stephenson.

প্রঃ—I was calling a relation of mine why have you come ?

উঃ—Because the appearance of your relation is like that of mine.

[বলা আবশ্যক আমার জামাতা অতি সুন্দর ছিল। এবং এন্‌লার্জ করা ফটোতে রংটা আরও ধবধবে দেখাইয়া থাকে।]

প্রঃ—What were you in life ?

উঃ—I was the G. O. C. in the battle of Agincourt.

[আমি দীনেশ ও তার সঙ্গীকে বলিলাম আমি তো English History প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু Agincourt নামটাই মনে আছে। তোমরা ও সম্বন্ধে কিছু বলিতে পার কি ? দীনেশ বলিল যে তাদের সময়ে English History ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাঠ্য ছিল না। সে ও নাম শোনে নাই। অপর যুবকটি বলিল তাহার বিদ্যা সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত। তাহাকে ও প্রশ্ন করা বৃথা।]

প্রঃ—Who were the rival parties in the battle ?

উঃ—The battle was fought between the English and the French.

প্রঃ—What was the result ?

উঃ—The English were victorious, though I, the Commanden-in-chief fell in that battle.

প্রঃ—Who was the king of England then ?

উঃ—England was not a monarchy then.

প্রঃ—Was it then under Cromwell ?

উঃ—No, it was not under Cromwell.

প্রঃ—Who was the person in charge of the government ?

উঃ—Bloody Mary.

প্রঃ—In what year the battle was fought ?

উঃ—It is not possible for me to give you the exact year at this distance of time, but it was fought either in 1415 or in 1416.

প্রঃ—Are you sure ?

উঃ—Yes, I am pretty sure.

প্রঃ—Do you want to say anything more ?

উঃ—My blood is seized with intoxication of destruction.

[আমি দীনেশ ও তাহার সঙ্গীকে এই লাইনটি পড়িয়া শুনাইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম,—ইহার মানে কি বলিতে পার ? একজন বলিল intoxication মানে তো নেশা, আর ceased মানে থামিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম ceased নহে, seized। তাহারা বলিল ঐ শব্দের মানে তাহারা জানেনা। Seized মানেই যখন তাহারা জানে না তখন ঐ metaphorical sentence-এর মানে উহারা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না এবং উহা যে তাহাদের ভাষা হইতেই পারে না সে কথা ধ্রুব সত্য। ইহার মানে 'ধ্বংসের নেশা আমার রক্তকে অধিকার করিয়াছে' অর্থাৎ আমার রক্তে খুন চাপিয়াছে।]

প্রঃ—Have you come to destroy me ?

উঃ—No, I have a mind to fight on the side of the Germans.

[ঐ সময়ে এবেসিনিয়ার যুদ্ধ চলিতেছিল। তখনকার দিনে আমরা জানিতাম যে হিটলারের গুরু মুসোলিনী তাহার ইতালিকে ও খুব মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।]

প্রঃ—Not on the side of Musolini ?

উঃ—No.

প্রঃ—Why not ?

উঃ—That's my wish.

[এ সময়ে দ্বিতীয় জার্মান যুদ্ধ আরম্ভ হইতে অনেক বিলম্ব আছে। Stephenson spirit অবস্থায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল দেশের সমরায়োজন যোদ্ধার চোখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল এবং জার্মানীর অসাধারণ আয়োজন দেখিয়া সে নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়া থাকিবে এবং উহার তুলনায় ইতালির আয়োজন যে অকিঞ্চিৎকর সেনাপতি হিসাবে সব দেখিয়া সে কথা বুঝা তাহার পক্ষে কিছুই শক্ত ছিল না।

জার্মানদের পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছুক হওয়ার মূলে আরও একটা কারণ ছিল। সে ফরাসিদের হাতে নিহত হইয়াছে। এবারে ফরাসিরা ইংরেজের বন্ধু। সুতরাং ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ফরাসিদের উপর প্রতিশোধ লওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু জার্মানরা চিরদিনই ফরাসিদের দুশমন। সুতরাং তাহাদের হইয়া লড়িলেই সে তাহার শত্রুর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইবে। তাহার মনোভাব এইরূপ ছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস।]

প্রঃ—Will you as a spirit ever be able to fight on the side of any party ?

উঃ—That of course is more than what I can say for certain.

আমি—I have a mind to know something about your wife.

আত্মা—Why ?

আমি—Only to satisfy my curiosity.

উঃ—She was a Scotch lady. Her name was Flor···

(পরের অক্ষরগুলি অস্পষ্ট ছিল।)

আমি—Florence. I suppose.

উঃ—No, you cannot read English correctly.

আমি—The pencil is bad.

আত্মা—No, the paper is bad. Please bring in another piece of white paper.

[কাগজ আনিয়া দেওয়া হইলে লেখা পড়িল—]

Thank you for your kind trouble. Her name was Florina. She was the prettiest woman I ever saw. Her lips were like the juice of pommegranate. Her hair was like very thin fibre made of gold.

আমি—I see, you were not only a warrior but a poet too !

আত্মা—Thank you for your magnanimity.

আমি—What was her age when you died ?

আত্মা—O God ! only twenty-three !

আমি—And what was your age then ?

আত্মা—Twenty-eight years.

আমি—You rose to such eminance at such an early age !

আত্মা—Thank you very much for your kind appreciation.

আমি—Have you ever met your wife after her death ?

আত্মা—No. But had I met her I would have taught her such a lesson as she could never forget.

আমি—Why ? What did she do ?

আত্মা—She ran away with a soldier of my rank.

আমি—Did she marry him ?

আত্মা—No.

আমি—Had you no children ?

আত্মা—I had two boys.

আমি—What became of them ?

আত্মা—Alas ! they went on like street beggars. Afterwards both of them became soldiers. But they did not take revange on their mother.

আমি—What is your present existence like ?

আত্মা—It is inscrutable.

[জিজ্ঞাসা করিলাম দীনেশ ও তাহার সঙ্গী ঐ শব্দটির মানে জানে কিনা। তাহারা বলিল—জানে না।]

প্রঃ—They do not know the meaning of the word 'inscrutable'—would you please explain it to them.

উঃ—Beyond human knowledge.

[উহারা কেহই মানে জানে না অথচ উহাদের হাতেই মানে লেখা হইল।]

প্রঃ—You were a Christian. Jesus Christ asks His followers not to kill. But you wilfully disobeyed that commandment of His. What have you got to say in self-defence ?

উঃ—It is a very intricate problem. But I believe our Lord Jesus will save us, the soldiers, who fought for their motherland.

প্রঃ—Your Jesus has not saved you in course of these five hundred years. When then will he save you ?

উঃ—You are a child. You know nothing of Christianity.

[আমার তখন resurrection-এর কথা মনে পড়িল। ধমক খাইয়া ধর্মনীতি ছাড়িয়া রাজনীতিতে প্রবেশ করিলাম।]

প্রঃ—Do you know where you are at present ?

উঃ—Yes, in Calcutta.

প্রঃ—What is it and where ?

উঃ—It is a city in India.

প্রঃ—Who governs this country ?

উঃ—My countrymen.

প্রঃ—Do your countrymen govern the country well ?

উঃ—I don't know that. I am a soldier and not a politician.

[বুঝিলাম মৃত্যুর ৫০০ বৎসর পরেও ইংরেজের দেশাত্মবোধ পুরা মাত্রায়ই থাকে এবং স্বদেশবাসীর সম্বন্ধে কোন অসুবিধা—

জনক প্রশ্নের সম্মুখীন হইলে সরল উত্তর না দিয়া পাশ কাটাইয়া যাওয়ার স্বভাব সে তখনও ত্যাগ করিতে পারে না।

প্রঃ—It is now half-past eleven, would you please come on another day ?

উঃ—Yes, if you call me again.

[পরদিবস ডক্টর নরেন লাহার লাইব্রেরিতে গিয়া Green-এর ইংলণ্ডের ইতিহাস খুলিয়া দেখা গেল যে Agincourt-এর যুদ্ধ ১৪১৫ সনেই ঘটিয়াছিল। তবে ইংলণ্ডে তখন রাজতন্ত্র ছিল না একথা ঠিক বলা চলে না। এবং 'Bloody Mary'-ও তখন ইংলণ্ডের কর্তা ছিলেন না। কিন্তু দুইটি কথাই যেন সত্যের কান ঘেষিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইল। প্রথমতঃ পঞ্চম হেনরী ঐ সময়ে নামে মাত্র ইংলণ্ডের রাজা হইলেও তিনি ফরাসি দেশে যুদ্ধ করিতে যাইবার পূর্বে স্বীয় ভ্রাতা Duke of Bedford-কে Regent করিয়া রাখিয়া যান। হেনরীর বয়স তখন ২৬ বৎসর মাত্র ছিল। Bedford-এর বয়স তার চেয়ে অনেক কম ছিল। রাজ্যের প্রকৃত কর্তৃত্ব তাহার মাতা Mary-র হস্তেই ছিল। তবে তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ Bloody Mary যে নহেন তাহা নিশ্চয়। Bloody Mary ছিলেন অনেক পরবর্তী সময়ে। এই অসামঞ্জস্যের কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। হয়তো General Stephenson-এর কোন কারণে তাঁহার উপর আক্রোশ ছিল। তাই তাঁহাকেও Bloody আখ্যা দিয়াছেন।]

জগদীশ মুখোপাধ্যায়

[এই ঋষিকল্প ব্যক্তি বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে Logic এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে Astronomy পড়াইতেন।

ছাত্রজীবনে তিনি অশ্বিনীকুমার দত্তের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করেন। অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে ঐ সময়ে একদিন তিনি পরমহংস মহাশয়কে দেখিতে দক্ষিনেশ্বর যান। পরমহংস তাঁহাকে দেখিয়া বলেন,—ও অশ্বিনী, তুমি এটিকে কোথায় পেলে ? বেড়ে তো ! বেড়ে তো ! এ কথা আমি অশ্বিনীবাবুর নিজ মুখে শুনিয়াছিলাম। ইনি চিরকুমার ছিলেন।]

প্রঃ—আপনি কে ?

উঃ—জগদীশ মুখোপাধ্যায়।

প্রঃ—আপনি কোথায় আছেন ?

উঃ—নামলোকে।

প্রঃ—অশ্বিনীবাবু আর আপনি তো একই লোকে আছেন ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—তবে তিনি যে বলিলেন আছেন 'অমরলোকে'। এর মানে কি ?

উঃ—এই লোকের শাস্ত্রীয় নাম মহর্লোক—'ভূঃ ভূব ঃ স্ব ঃ মহ ঃ জন ঃ তপ ঃ সত্য ঃ' মনে আছে তো সন্ধ্যামন্ত্রের মন্ত্র ? মহর্লোককেই এখানকার চলতি ভাষায় বলে অমরলোক।

প্রঃ—আর নামলোকটি কি ?

উঃ—উহা অমরলোকেরই এক অংশ। উহাকে অমরলোকও বলে। যেমন অমুক স্থান ডাক নাম অমুক। সেইরূপ নামলোক—ডাকনাম মহর্লোক।

প্রঃ—আপনারা কতদূরের খোঁজখবর নিতে পারেন ?

উঃ—নীচের ও একই লোকের খোঁজ নিতে পারি। উর্ধ-লোকের পারি না।

প্রঃ—ওখানে কি করেন ?

উঃ—নাম করি।

প্রঃ—আমাকে কি করিতে উপদেশ দেন ?

উঃ—নাম করিবে। সৎ কাজও করিবে।

প্রঃ—শাস্ত্রীয় ভূবর্লোক কোনটা ?

উঃ—অমর স্তর ও অমরধাম।

প্রঃ—ভূলোক ?

উঃ—তোমরা যেখানে থাক। Earth-bound spirit-রাও ওখানে থাকে।

আমি—স্যার, আপনাকে disturb করিতে ইহলোকেই সাহস পাই নাই—ওখানে আপনাকে আর উত্যক্ত করিতে চাই না।

উঃ—ভাল।

শ্রীদাদা (১)

আমি—কে আপনি, দাদা ?

দাদা—হাঁ।

আমি—এমন একটা কথা লিখুন যাতে আমার খাঁটি বিশ্বাস হয় যে আপনি শ্রীদাদাই।

দাদা—তুমরা এখন কলিকাতায় আছ।

আমি—এটা ঠিক দাদারই মত সরল উত্তর হইল : কিন্তু আমার পুরাপুরি বিশ্বাস ইহাতে হইল না।

['পুরাপুরি' কথাটা বলিবার কারণ নিম্নরূপ : আমাদের কলিকাতায় আসিবার পূর্বে তিনি দেহ রাখিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা যে কলিকাতায় আছি এটা জানিতে পারাটাকেই দাদা এমন একটা কিছু মনে করিয়াছেন যাহা আত্মার সর্বত্র দৃষ্টির শক্তি ব্যতীত সম্ভব হয় না। কিন্তু আমার সন্দেহের কারণ যে অন্যত্র দাদা সরল মনে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। একথাটা তো ননীর

জানা। সুতরাং ইহাতে আমার সন্দেহ নিরাকৃত হয় না। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ননীর ধারণা ছিল আমরা কলিকাতায় আসিবার পরে তিনি দেহ রাখিয়াছেন। একথাটা ননীকে পরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম। কাজেই ননীর ধারণা ছিল আমাদের কলিকাতায় চলিয়া আসার খবর দাদা জীবিতকালেই পাইয়াছিলেন। সুতরাং ননীর দিক দিয়াও উহা আমার প্রশ্নের ঠিক জবাব নয়। কিন্তু দাদার অজ্ঞাতে 'তুমার' কথাটার মধ্যেই যে আমার প্রশ্নের খাঁটি জবাব নিহিত ছিল তা তখন বুঝিতে পারি নাই। তাই বলিলাম—]

আমি—আমার বিশ্বাস জন্মাইবার উপযোগী আর একটা কিছু বলুন।

দাদা—তুমার স্ত্রী আমার দেওয়া নাম জপ করে ও আমার প্রচারিত পট পূজা করে।

আমি—আপনি তো কই তাকে নাম দেন নাই। তবে সে আপনার দেওয়া নাম জপ করে একথা কিরূপে হইতে পারে ?

দাদা—হাঁ, তা সে করে।

[একথাটা ঠিক। তবে এ বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে চাই না। কিন্তু এ কথাটা আমি ও আমার স্ত্রী ব্যতীত জগতে আর কেহই জানে না। শ্রীদাদাও জীবিত থাকিতে ইহা জানিতেন না। আর পট পূজার কথাও সত্য। শ্রীদাদার মন্ত্রশিষ্য জগদীশ দাস (যাহাকে পিতাঠাকুর মহাশয় জগদীশ বাবু বলিয়াছিলেন) যখন পীড়িত হইয়া কলিকাতা হইতে নিজ বাড়িতে যায় তখন সে শ্রীদাদার প্রচারিত যে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার পট প্রত্যহ পূজা করিত তাহা আমার স্ত্রীর কাছে রাখিয়া বলিয়া গিয়াছিল—বৌমা তুমি এই পটখানাতে নিত্য জলতুলসী দিও। আমি ফিরিয়া আসিলে আবার লইয়া যাইব। জগদীশ আর ফিরিল না। তদবধি আমার স্ত্রীই উহা পূজা করিয়া আসিতেছে। ইহা অবশ্য ননীর জানা।

কিন্তু ঐ পট যে শ্রীদাদারই প্রসারিত তাহা ননী অথবা তাহা
মাতা কেহই জানিত না। আমি অবশ্য জানিতাম।]

আমি—আচ্ছা দাদা, আপনার আসল নামটা বলুন তো।

দাদা—শ্রীগোপাল।

আমি—ও নাম তো আপনার না। আমি আপনার প্রকৃত নাম শুনিতে চাই।

দাদা—শ্রীমায়ের কাছে জিজ্ঞাসা কর উহাই আমার প্রকৃত নাম।

[এই উত্তরে আমি স্তম্ভিত হইলাম। শ্রীদাদার সংসারী নাম ছিল বসন্ত কুমার দে। ননী বা তার মা তাহা জানিত না। সে বা তার মা তাঁহাকে কখনও দেখেও নাই। তিনি সিদ্ধি লাভ করিবার পর আদিষ্ট হইয়া নিজের স্ত্রীকে (শ্রীমাকে) সর্বদা প্রকাশ্যে মাতৃ সম্বোধন করিতেন। শ্রীমাও তাঁহাকে সর্বদা গোপাল বলিয়া ডাকিতেন। এই শেষ কথাটি আমার খুবই জানা থাকা সত্ত্বেও আমি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই ঘটিল যে, ননীর হাতে বসন্ত কুমার দে নামটি লেখা পড়ে কিনা পরীক্ষা করিবার মতলবে তাঁহার প্রকৃত নাম জানিতে চাহিয়াছিলাম। কারণ তাহাতে আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইত। কিন্তু শ্রীদাদা তাঁহার পরিত্যক্ত সংসারী নাম লিখিলেন না। অথচ এমন নাম লিখিলেন যাহা তাঁহার সিদ্ধিলাভের পরের প্রকৃত নাম এবং যাহা ননী তো জানিতই না, তার বাবাও বিস্মৃত হইয়াছিল। 'শ্রীমায়ের কাছে জিজ্ঞাসা কর'—এই কথাও খুবই অর্থপূর্ণ কারণ তিনিই ঐ নামে ডাকিতেন।]

আমি—দাদা, আমি ভূতের উপদ্রবে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। কি করিব বলুন তো।

উঃ—তমার ঘরের সবাইকে তুলসীর মালা তো ধরাইয়াছ; এখন সকলকে খুব নাম চালাইতে বল।

প্রঃ—আপনি কোথায় আছেন ?

উঃ—আনন্দধামে।

প্রঃ—কি করেন?

উঃ—আনন্দ করি।

প্রঃ—শ্রীমা কি ওখানে আছেন ?

উঃ—না তিনি এখানে নাই।

প্রঃ—অনেক কথাই জানিবার আছে। কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করিয়া আপনার আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছি। আর আপনার সময় নষ্ট করিব না।

উঃ—জয় গোর। [এটি দাদার অভ্যস্ত বুলি। ননী ইহা জানিত না]

প্লানচেট ছাড়িবার পর ননী হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা ঐ দেখুন লম্বা চুল লম্বা দাড়িওয়ালা একজন বেলুনের মত আকাশে উচু দিকে ছুটিয়া উপরে উঠিতেছে। ঐ দেখুন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অবশ্য আমি কিছু দেখিলাম না। একটু পরে ননীও বলিল, এখন আর দেখা যায় না। শ্রীদাদার লম্বা চুলদাড়ি ছিল। ফটো দেখিয়া আত্মা আনা হইয়াছিল।

কালীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদাদার আত্মা 'তুমার' 'তুমরা' কেন লিখিলেন সে প্রশ্ন আমার মনে উঠিয়াছিল। কিন্তু কোন উত্তর তখন পাই নাই। আমার জনৈক বন্ধু শ্রীদাদার মর্মী ভক্ত নিবারণ চন্দ্র বৈদ্যের সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হইলে বলিলাম,—তোমার তো শ্রীদাদার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি চলিত। দাদা তোমার ও তোমরাকে কি লিখিতেন ? নিবারণ বলিল, তিনি লিখিতেনও 'তুমার' 'তুমরা' বলিতেনও ঐরূপ। ওটা কুমিল্লা জিলার উচ্চারণ। কেন এ প্রশ্ন করিতেছি জিজ্ঞাসা করায় আমি প্লানচেটের বিষয় সংক্ষেপে কিছু

বলিলাম। সে তখনই আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে আসিল। ঐ দিন ঐ সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্তার পরে আমি তাহাকে বলিলাম যে, কালীশ পন্ডিতমহাশয়ের আত্মা ফটোর অভাবে আনা গেল না। অশ্বিনীবাবু তাঁহার সম্বন্ধে কোন খবর দিতে পারিলেন না। তোমাকে তো পন্ডিতমহাশয় খুব ভালবাসিতেন, আমার প্রতিও তাঁহার স্নেহ ছিল। আমরা দুজনে একত্র চেষ্টা করিয়াও কি তাঁহাকে হাজির করিতে পারিব না। দেখিনা চেষ্টা করিয়া। আমার হাতে প্লানচেট চলে না। তোমার হাতেও চলিবে কিনা জানিনা। তাহাতে ক্ষতি নাই। যখনই প্লানচেট নড়িয়া উঠিবে তখনই উহা ননীর হাতে ছাড়িয়া দিব। দেখা যাক না কি দাঁড়ায়। সেই রূপেই করা হইল।

প্রঃ—কে ?

উঃ—কালীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। [ননীর হাতে প্লানচেট ছাড়িয়া দিলাম।]

আমি—পন্ডিত মহাশয়, আপনি কোথায় আছেন ?

পণ্ডিতমহাশয়—জনলোকে।

আমি—সে তো মহলোকের উপরে ?

পণ্ডিতমহাশয়—হ্যাঁ, উপরে।

আমি—কলেরা রোগীর সেবার কি এতই মাহাত্ম্য যে অশ্বিনীবাবু জগদীশবাবুরও উপরের ক্লাসে প্রমোশন পাইয়াছেন ?

পণ্ডিতমহাশয়—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। তাই তো দেখি।

[তিনি বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের স্কুল বিভাগের হেড পণ্ডিত এবং Little brothers of the poor নামক অশ্বিনীবাবু গঠিত শুশ্রূষাকারী দলের নেতা ছিলেন। তখন প্রতি বৎসর শীত কালে খুব কলেরার প্রাদুর্ভাব হইত। ইনি ঐ রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন।

অশ্বিনীবাবু জগদীশবাবু ও পণ্ডিত মহাশয়কে আমরা বরিশালের Trinity বলিতাম। তিনি ভক্ত সাধক ছিলেন। এক সময়ে একক্রমে ৪/৫ রাত্রি ইহার সঙ্গে একই বিছানায় শুইবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। তখন রোজই দেখিতাম রাত্রি দুইটা কি আড়াইটার সময় উঠিয়া বিছানায় বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। শুনিয়াছি ইনি মৃত্যুশয্যায় বসিয়া কীর্তন শুনিতে শুনিতে ও হাতে তুড়ি দিতে দিতে দেহত্যাগ করিয়া ছিলেন। আমার কন্যা কখনও ইঁহার নামও শোনে নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের হাসিবার অভ্যাসটি অবিকল ননীর হাতে লিখিত হইল !]

আমি—পণ্ডিতমহাশয়, ওখানে আর কে আছেন ?

পণ্ডিতমহাশয়—তোমাদের চেনা কেহ নাই।

আমি—যাঁহাদের নাম শুনিয়াছি এমন সাধু মহাত্মা অবশ্যাই কেহ না কেহ থাকিবেন।

পণ্ডিতমহাশয়—সনা ঠাকুর আছেন।

[ননী জিজ্ঞাসা করিল, সনা ঠাকুর কে ? আমি বলিলাম, বরিশালের থানার কালীবাড়িতে এক পুরোহিত ঠাকুর থাকিতেন। তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকমুখে শুনিয়াছি। তাঁহারই কথা বলিতেছেন কিনা বুঝিতেছি না। নিবারণ বলিল তাঁহার নাম তো ছিল সোনা ঠাকুর। আমি বলিলাম, আমিও তো সোনা ঠাকুর বলিয়াই জানি। তবে আমরা মুর্খেরা যাহাকে সোনা বলি পণ্ডিতেরা যদি তাঁহাকে 'সনা' না বলেন তবে আর তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় কি হইল ! এই কথা বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের উপর আমি বক্রোক্তি করিয়াছিলাম। তিনি যে উহা শুনিতেছেন তাহা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

[ইহার বহু বৎসর পরে শ্রীদাদার প্রিয়তম ভক্ত ও গৌরাঙ্গগত প্রাণপ্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয় একদিন

আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি নাকি দাদার আত্মা আনিয়াছিলে ? ঐ সময়ে কথা প্রসঙ্গে পণ্ডিতমহাশয় সোনা না বলিয়া সনা ঠাকুর বলিয়াছেন বিধুবাবুকে এই কথাও বলি। তিনি বলিলেন, সোনা না হে সনাই। কারণ তাঁহার নাম ছিল সনাতন ভট্টাচার্য। আমরা তাঁহার কাছে প্রায়ই যাইতাম। অশ্বিনীবাবু ও জগদীশবাবু অনেকসময়ে গভীর রাত্রেও যাইতেন। তাঁহারাও সনাঠাকুরই বলিতেন। অশ্বিনীবাবুকে তিনি বলিতেন "রসগোল্লা"। বিধুবাবু ব্রজমোহন কলেজে আমার বহু পূর্বে পড়িতেন। আমরা শুধু সনা ঠাকুরের নামই শুনিয়াছি। আমাদের সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন না। আমি বিধুবাবুকে বলিয়াছিলাম, আপনাদের দেখা ও জানা সনা ঠাকুর আমার শোনা, তাই সোনা ঠাকুর হইয়াছে।]

আমি—আপনি কি করেন ?

পণ্ডিতমহাশয়—নামামৃত পান করি।

আমি—ওটা তো পণ্ডিতের উপযুক্ত আলঙ্কারিক ভাষা।

পণ্ডিতমহাশয়—অমৃত আস্বাদনের মত অনুভূতি হয়।

আমি—আমাকে কি করিতে উপদেশ দেন ?

পণ্ডিতমহাশয়—সর্বদা নাম কর।

আমি—এখন অনেক রাত্রি। দোকান সব বন্ধ হইয়াছে। দয়া করিয়া যদি আর একদিন আসেন তো কিছু খাইতে দিতে ইচ্ছা করি।

পণ্ডিতমহাশয়—তুমি আমাকে আর কি খাওয়াইবে ? আমি তো বলিয়াছি আমি সর্বদা নামামৃত পান করিতেছি। তাহার চেয়ে কোন্ মিষ্টিটা বেশী মিষ্টি ? তবে তোমার তৃপ্তির জন্য আমি অবশ্যই কিছু গ্রহণ করিব। বৌমাকে বল একটু আখের গুড় আর এক গ্লাস জল দিতে। [তাহাই দেওয়া হইল।]

[এ সেই জগদীশ যাহাকে আমার পিতাঠাকুর বলিয়াছিলেন জগদীশ বারৈ এবং যে তাহার গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার পট আমার স্ত্রীকে দিয়াছিল। জগদীশ অতি মহৎ চরিত্রের যুবক ছিল। সে ছিল শ্রীদাদার শিষ্য। তিনি তাহার নাম দিয়াছিলেন 'কৃষ্ণদাস'। নাম কীর্তনে তাহার খুব আসক্তি ছিল। জগদীশ কলিকাতায় যে বাড়িতে থাকিত সে বাড়িতে তিন-চারজনার স্মল পক্স্ হয়। নিজের টীকা না থাকা সত্বেও আমার নিষেধ না মানিয়া তাহাদের সেবা করে। ফলে বসন্তে আক্রান্ত হইয়া খুলনা জিলার নিজ বাটীতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার আত্মা আনিবার জন্য পূর্বে কয়েকবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হই। প্রধানতঃ বিফল হইয়াছিলাম তারানাথের কারণেই।]

আমি—কে ?

আত্মা—সতীশবাবু—

আমি—আবার কোন সতীশবাবু আসিল ? আমি তো জ্বল-জীবন্ত বসিয়া আছি।

উঃ—আমি সতীশবাবু না। আপনাকে ডাকিতেছি।

আমি—আপনি কে ?

উঃ—তারানাথ এখানে। অন্য ঘরে চলুন।

[আমরা অন্য এক ঘরে গেলাম।]

আমি—আপনি কে এবার বলুন।

উঃ—আমি জগদীশ।

আমি—অশ্বিনীবাবু বলিয়াছেন খারাপ আত্মারা ঘরে ঢুকিতে পারে না। তারানাথ কি করিয়া আমাদের ওঘরে গেল ?

উঃ—নিজের ঘরে ঢুকিতে পারে। তারানাথ ঐ ঘরেই থাকিত।

ঐ যে এ ঘরের জানালায় আসিয়া ও উঁকি মারিতেছে। জানালাটা বন্ধ করিতে বলুন। কি দুর্গন্ধ! [জানালা বন্ধ করা হইল।]

আমি—তুমি তো'খুব উঁচু স্থানে গিয়াছ বাবার কাছে শুনিয়াছিলাম।

উঃ—হাঁ

আমি—ওখানে কি কর ?

উঃ—নাম করি। কীর্তন করি।

আমি—নাচ না ?

[জীবিতাবস্থায় সে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর বলিয়া অষ্টপ্রহর কীর্তনে খুব নাচিত।]

উঃ—হাঁ, খুব নাচি।

আমি—মালা জপ করিতে পার না নিশ্চয়।

উঃ—তাও পারি।

আমি—কি করিয়া ? মালা তো ওখানে নাই।

উঃ—তবু পারি। কি রূপে তা বুঝানো শক্ত।

আমি—কেমন আছ ?

উঃ—ভালই আছি। কোন ঝঞ্ঝাট নাই। যত খুসী নাম করিতে পারি।

['হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ রাম রাম হরে হরে' কয়েক বার এইরূপ লিখিয়া পরে লিখিল—'বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর'। এই সময়ে প্লানচেট খুব দ্রুত চলিতে লাগিল। বড় কাগজের এ মাথা ও মাথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি যেন লিখিতে লাগিল—তাহা অস্পষ্ট। ননী বলিল, জগদীশ দাদা বোধহয় নাচিতেছে। তখন হঠাৎ প্ল্যানচেটে স্পষ্ট লেখা পড়িল—'হুঁ'। আমরাও সবাই বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর বলিতে লগিলাম। শব্দ শুনিয়া বাড়ির অনেকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার দৌহিত্র ও

শিশুপুত্র ননীর হাত সরাইয়া দিয়া দুজনেই পর পর একাকী প্লানচেটে হাত দিল। তাদের হাতেও প্লানচেট পূর্ববৎ দ্রুত ঘুরিতে লাগিল। উহা যেন একটা প্রাণবান সচল পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খানিক পরে ননীর হাতে উহাতে লেখা পড়িল 'এক গ্লাস জল চাই'। আমি বলিলাম অত নাচিলে জীবন্তেরই পিপাসা লাগে, মৃতের তো লাগিতেই পারে। জল এক গ্লাস আনিয়া রাখা হইল।]

আমি—জগদীশ, অশ্বিনীবাবু বলিয়াছিলেন তিনি যেখানে আছেন তথায় স্ত্রী লোকের অধিকার নাই। একথা শুনিয়া তোমার বোন ননী আমাকে তাহার স্বামীর গয়ায় পিন্ড দিতে নিষেধ করিয়াছে। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছ। পিণ্ড পইেলে জামাতা যে উচ্চতর অমর লোকে যাইবে স্ত্রী লোকের যদি সেখানে অধিকার না থাকে তবে তো নিজ মৃত্যুর পরেও ননী তাহার স্বামীর দেখা পাইবে না। এ সমস্যার সমাধান কি?

উঃ—[অনেক পরে লিখিল] অশ্বিনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন স্বামী-স্ত্রীর বা ঘনিষ্ট আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ইচ্ছা করিলেই চলিতে পারে। [তারপরে বিনা প্রশ্নে লেখা পড়িল—] ননী, তোমার মাকে আমি খোকনের মত বৌমা ডাকিতাম। তোমাদের নিজ মায়ের পেটের ভাইবোনের মতই দেখিতাম। একদিন আমি খেউদামি (বরিশালের উপ-ভাষায় শব্দটির অর্থ দুষ্টামি) করিয়া তোমার চুল ধরিয়া টানিয়াছিলাম। তুমি অন্যরূপ মনে করিয়া আমার উপর চটিয়া উঠিয়াছিলে। তুমি আমাকে সন্দেহ করিয়াছ ভাবিয়া আমার দুঃখ হইয়াছিল।

আমি—তোমার বাবাকে কিছু বলিবে?

উঃ—না। তার অনেক থাকা আছে।

আমি—তোমার কথা বুঝিলাম না। তোমার মত ছেলে হারাইয়া যদি এখনো তাঁহার অনেকদিন বাধ্য হইয়া এখানে 'থাকা' হয়, তাহা তাহার পক্ষে সান্ত্বনার কথা তো নয়ই, বরং দুঃখেরই কথা।

উঃ—না, অনেক ধাকা আছে।

আমি—থাকার তবু একটা মানে ছিল। ধাকার তো কোন মানেই হয় না।

উঃ—উহা উচ্চারণ হয় না।

আমি—তুমি কি 'টাকা' বলিতে চাও ?

উঃ—হাঁ।

আমি—আচ্ছা বলতো মাছ !

উঃ—ফাছ।

আমি—(হাসিয়া) বেশ বলিয়াছ।

উঃ—মুখে আসে না।

আমি—জীবনে তো মুখের মধ্যে ও চিজ কখনও যায় নাই। এখন দেখিতেছি মুখ হইতে শব্দটাও বাহির হয় না। [জগদীশ বালক অবস্থায়ও নিরামিষাশী ছিল।]

উঃ—ভিতরে না গেলে আর কিরূপে বাহির হইবে ? হাঃ হাঃ হাঃ।

আমি—আমি একদিন অমরলোকস্থ আমার পরিচিত আত্মাদের ভোজ দিব বলিয়া অশ্বিনীবাবুকে বলিয়াছি। তোমাকে পাইয়া ভালই হইল। তুমি একটু ভলাণ্টিয়ারী করিতে পারিবে—অর্থাৎ জনে জনে নিমন্ত্রণ করিতে ও নির্দিষ্ট দিনে ডাকিয়া আনিতে পারিবে ?

উঃ—হাঁ, তা অবশ্যই পারিব।

আমি—আমার বাবা ওখানে আছেন, জানো ?

উঃ—হাঁ, কথা হইয়াছে।

আমি—তিনি তোমার নাম বলিয়াছিলেন জগদীশ বারৈ।

উঃ—হাঃ হাঃ হাঃ।

[এই সময় ননী জল খাইতে চাহিল। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—]

আমি—তুমি একে কায়েত তাতে আত্মা। তোমার খাওয়া জল ননী খাইতে পারে তো ?

উঃ—পারে।

আত্মার ভোজ

পরলোকে জগদীশকে ভলাণ্টিয়ার পাইয়া আমি তাহার দ্বারা আত্মাদের জনে জনে নিমন্ত্রণ করিলাম। এবং অশ্বিনীবাবুর নির্দেশমত প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া ডাব আনাইলাম ও একটি করিয়া আম তৎসহ আনাইলাম। মোট নয়টি আত্মা ছিলেন। তখন আম সবেমাত্র উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। আতা তো মিলিলই না।

নয় জনার উপযোগী আসন করিয়া খাবার দিতে গিয়া দেখা গেল একটা করিয়া ফল বেশী আনা সত্ত্বেও একটা করিয়া কম পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং আটটি ডাব ও আটটি আম কাটিয়া পৃথক পৃথক পাত্রে আসনের সম্মুখে রাখা হইল ও গ্লাসে করিয়া জল রাখা হইল। তখন প্লানচেটে জগদীশকে ডাকা হইল।

প্রঃ—জগদীশ ?

উঃ—আজ্ঞে।

প্রঃ—একটা করিয়া ফল বেশী আনা সত্বেও একটা করিয়া কম হইয়া গিয়াছে। ইহা বোধহয় তোমার নূতন ভাইটি আর তোমার ভাগিনেয় মহাশয়ের কাজ। এখন কি করি ?

উঃ—তা হউক। আমাকে না হয় না-ই দিলেন।

প্রঃ—তুমি গিয়া বাবার সঙ্গে কথা বলিয়া আত্মাদের ডাকিয়া আন।

উঃ—হাঁ, তাহাই করিতেছি।

[কিছুক্ষণ পরে—]

প্রঃ—জগদীশ, সব আত্মারা কি আসিয়াছেন ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—তাঁহাদের বসিতে অনুরোধ কর।

উঃ—হাঁ, তাঁহারা বসিয়াছেন।

প্রঃ—এক দিক হইতে অর্থাৎ পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর তাঁহাদের নাম বলিতে থাক, আমরা অনুভব করি কে কোথায় বসিয়াছেন।

উঃ—জগদীশবাবু, অম্বিকাবাবু, আপনার বাবা, অশ্বিনীবাবু, দেশবন্ধু, আপনার তাঐ মহাশয়, বড় জ্যেঠা মহাশয়, মেজ জ্যেঠামহাশয়।

প্রঃ—আমার কোন্ তাঐ মহাশয় ?

উঃ—কলসকাঠির পণ্ডিতমহাশয়। [মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ।]

প্রঃ—কই, তাঁহার কথা তো বাবা বলেন নাই। আর কবিরাজ মহাশয় আসিলেন না কেন ?

উঃ—পণ্ডিত মহাশয়ের নাম আপনার বাবা ভুলে আপনাকে বলেন নাই। কিন্তু এখন আসিবার সময় আপনার বাবা তাঁহার বগলের নীচে নিজ হাত ঢুকাইয়া দিয়া বলিলেন, —'বেয়াই আপনার যাইতে হইবে'। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—'উনিই যান, আমি যাইব না; আমি গেলে জিনিষ কম পড়িবে।' আপনার বাবার অনুরোধ সত্ত্বেও উনি আসিলেন না।

প্রঃ—ছি ঃ ছিঃ, ছেলেরা কি কাণ্ডটাই না করিল !

উঃ—তাতে আর কি হইয়াছে ? কবিরাজ মহাশয় কিছু মনে করিবেন না।

[এখানে আত্মাদের বসিবার ক্রমটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। মোট আটজনের মধ্যে কেন্দ্রস্থানে অশ্বিনীবাবু ও দেশবন্ধু। অশ্বিনীবাবুর দুইপাশে তাঁহার পরিচিত দুই জন—বাবা ও দেশবন্ধু। জগদীশবাবুর কুণো স্বভাব তাই তিনি অশ্বিনীবাবুর সান্নিধ্যের লোভও এড়াইয়া এক কোণে বসিয়াছেন। অম্বিকাবাবু বাবার খাতিরের লোক, সমব্যবসায়ী ও প্রতিদ্বন্দ্বী বাবার কাছেই বসিয়াছেন। তর্কবাগীশ মহাশয় ও ন্যায়রত্ন মহাশয় পাশাপাশি। বিলাত ফেরতাদের সমাজে লইবার পক্ষপাতী বিধবা বিবাহের পৃষ্ঠপোষক তর্কবাগীশ বসিয়াছেন দেশবন্ধুর গা ঘেঁষিয়া। জ্যেঠামহাশয়রা দুই ভাই পাশাপাশি। নিরীহ মেজ জ্যেঠামহাশয় এক কোণে।]

অনুকূল সেন

[অনুকূল সেন আমাদের বাহির সিমলার বাসাবাটির মালিক ছিলেন। তারানাথের গোত্র না জানিলে তাহার নামে পিণ্ড দেওয়া চলে না। সে তো তাহার পদবীটা পর্যন্ত বলিল না। তাই তাহার পরিচয়টা অনুকূলবাবুর নিকট হইতে কিছু জানা যায় কিনা আর তারানাথ নামে আদৌ কেহ তাঁহার বাড়িতে ছিল কি না জানিবার জন্য অনুকূলবাবুর আত্মা আনা হইল।]

প্রঃ—কে ?

উঃ—অনুকূল চন্দ্র সেন।

প্রঃ—আপনাকে কেন ডাকিয়াছি বলিতে পারেন ?

উঃ—ভুত ! [হ্রস্ব উ-কার]

প্রঃ—তারানাথ কে ?

উঃ—তা পরে বলচি, আগে আমার কি হবে বলুন।

[এ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গীয় আত্মা আনিয়াছিলাম। এবার পশ্চিমবঙ্গীয় তাই 'বলচি' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার।]

প্রঃ—কেন ? আপনার কি হইয়াছে ?

উঃ—আমি যে বড্ড কষ্ট পাচ্ছি।

প্রঃ—কেন ? আপনি না বলিয়াছিলেন,—'আমরা সিদ্ধবংশের (রামপ্রসাদের ভাইয়ের বংশের) লোক একুশ পুরুষের অবধি যাই কেন করি না, আমাদের মুক্তি আটকাবে কে ? [তাঁহার সুরাপানের উল্লেখ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে পরলোক সম্বন্ধে হুঁসিয়ার হইতে বলায় তিনি আমাকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন।]

উঃ—বলেছিলুম তো লোকের কাছে শুনে। এখন কাজে তো দেখচি অন্যরূপ। আপনি ঘোতা কে [তাঁহার পুত্র সুধীর সেন] লিখুন সে যেন শীঘ্র গয়ায় পিণ্ড দেয়।

প্রঃ—আচ্ছা তাহাকে আমি লিখিতেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন বলুন, তারানাথ কে ?

উঃ—ও এই বাড়িতে থাকতো ভাড়াটিয়া হিসাবে তিরিশ বছর আগে।

প্রঃ—আমি ওর আর সব সংবাদ পাইয়াছি। শুধু দুই-একটা খবর পাই নাই। ও আত্মহত্যা করিল কেন ? আর ওর গোত্র ও পুরা নাম কি ?

উঃ—গোত্র জানিনা। পুরা নাম তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রঃ—বন্দ্যোপাধ্যায় হইলে শাণ্ডিল্য গোত্র। ওর আত্মহত্যার কারণটা জানেন কি ?

প্রঃ—জানবো না কেন ? সবই জানি।

উঃ—দয়া করিয়া বলুন।

উঃ—ওর বউটা ছিল হারামজাদা। ভাসুরের সঙ্গে ছিল নষ্ট। তাই নিয়ে ঝগড়াঝাটি হত। একদিন আপিসে গেল,

আর ফিরল না। আমরা মনে করলুম বিবেকী হয়ে গেচে। আমার মৃত্যুর পরে জানতে পারলুম ও ডুবে মরেচে এবং আমার বাড়িতেই আচে।

প্রঃ—ও কোন অপিসে কাজ করিত ?

উঃ—টালা ওয়াটার ওয়ার্কসে।

প্রঃ—আমাকে এখন কি করিতে বলেন ? আমার বাড়ি ছাড়া উচিত কিনা ?

[অনেকক্ষণ প্লানচেট নড়িল না। বোধহয় কি বলিবেন তাহা ভাবিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে—]

উঃ—সে কথা আমি কি আর বলব ? আপনি বিবেচনা করে করবেন।

প্রঃ—এ কথাটা বলিতে এত কি চিন্তা করিলেন ?

উঃ—না তেমন কিছু চিন্তা করিনি।

আমি—দুই-তিন মিনিটের কম তো নয়। আপনি না বলিলেও আমি বলিতে পারি।

আত্মা—বলুন তো।

আমি—আপনি ভাবিতেছিলেন আপনার ছেলে সুধীর দূরে থাকিয়াও নিয়মিত ভাড়া পাইতেছিল। আমি চলিয়া গেলে অন্য ভাল ভাড়াটিয়া হয়ত সহজে মিলিবে না। কাজেই ছেলের লোকসান হইবে। আবার আমি থাকিলে পাছে আমার আরও কোন অনিষ্ট হয়। কাজেই হাঁ-না কোন পরামর্শ দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন।

আত্মা—ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম।

আমি—আপনার বাড়িতে আপনি অনেকদিন পরে আসিয়াছেন। কি খাবেন বলুন, আনাইয়া দিতেছি। রাত বেশী হয় নাই।

উঃ—কি আনাবেন ? কিছু যে খাবার যো নেই।

প্রঃ—একটু মিষ্টি ?

উঃ—খাবার উপায় নেইকো। এক গ্লাস খুব ঠাণ্ডা জল দিতে পারেন।

প্রঃ—আপনি যেখানে আছেন সে স্থানটার নাম কি ?

উঃ—অমর স্তর।

[শুধু এক গ্লাস জল দেওয়া হইল। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় অন্য সব আত্মারা পূর্ববঙ্গীয় বলিয়া সাধু ভাষায় লিখিয়াছেন ; কিন্তু কলিকাতার লোক অনুকুলবাবু আগাগোড়া কলিকাতার কথ্য ভাষায় লিখিয়াছেন।]

তারানাথ

[একদিন ছাতে বসিয়াই অপর একটি আত্মাকে আহ্বান করা হইল। কিন্তু ভুলে হরিনাম করা হয় নাই। এই সুযোগে তারানাথ আসিয়া প্লানচেট দখল করিল। আমিও তাহাকে ছাড়িতে নিষেধ করিয়া নিকট হইতে কথা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম।]

প্রঃ—আপনার পুরা নামটা লিখুন তো।

উঃ—তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রঃ—কোথায় থাকেন ?

উঃ—এই বাড়িতেই।

প্রঃ—কতদিন এভাবে এ বাড়িতে আছেন ?

উঃ—মৃত্যুর পর থেকে।

প্রঃ—মৃত্যুর আগে কোথায় ছিলেন ?

উঃ—এই বাড়িতে। আপনি যে ঘরে থাকেন সেই ঘরে।

প্রঃ—কোথায় কাজ করিতেন ?

উঃ—টালা ওয়াটার ওয়ার্কসে।

প্রঃ—কতদিন আগে ?

উঃ—প্রায় তিরিশ বৎসর আগে।

প্রঃ—কি ভাবে মরিয়াছিলেন ?

উঃ—গঙ্গায় ডুবিয়া।

প্রঃ—কেন মরিয়াছিলেন ?

উঃ—পারিবারিক ঘটনার ফলে।

প্রঃ—কি ঘটনা প্রকাশ করুন।

উঃ—না।

প্রঃ—না কেন ? বলিতে আপত্তি কি ?

উঃ—প্রাইবেট ব্যাপার জানিতে চাওয়া উচিত না।

প্রঃ—আপনার তো খুব উচিত-অনুচিতবোধ আছে দেখিতেছি। আমার ছেলেটিকে মারিবার সময় এ বোধটা কোথায় ছিল ?

উঃ—আমি তাহাকে মারি নাই।

প্রঃ—তবে মরিল কেন ?

উঃ—সে নিজেই ভয় পাইয়া মরিয়াছে।

প্রঃ—আপনি দেখা দিলেন কেন ?

উঃ—নইলে যে আমার মুক্তি হয় না। আমি মনে করিয়াছিলাম সে দেখিয়া আপনাকে বলিবে এবং আপনি আমার মুক্তির ব্যবস্থা করিবেন আর তাহার ভয় পাওয়ার প্রতীকারও করিবেন।

প্রঃ—আপনার উদ্দেশ্য হয় তো মন্দ ছিল না। কিন্তু আপনার স্বার্থপর ও অবিবেচক কার্যের ফলে আমি আমার পুত্রকে হারাইয়াছি।

উঃ—সে জন্য আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু আমার দোষ নাই। আপনি আমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন। আমার উপর রাগ করিবেন না।

প্রঃ—আপনি বলুন যে, আপনি এ বাড়ির অপর কাহারও সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না এবং কাহারও কোন ক্ষতি করিবেন না।

উঃ—হাঁ, আমি তাই বলিতেছি। আমি কিছু ক্ষতি করিব না। কারণ আপনার সঙ্গে তো পরিচয় হইলই। কিন্তু অন্যে করিলে আমাকে দোষী করিবেন না।

প্রঃ—অন্য আবার কে ক্ষতি করিবে ?

উঃ—আরও ভূত এ বাড়িতে আছে।

প্রঃ—আর কয়টা ?

উঃ—আরও দুইটা।

প্রঃ—তারা কারা ?

উঃ—বাড়িওয়ালার বংশের লোক।

প্রঃ—তাদের নাম কি ?

উঃ—অশ্বিনী ও নিতাই।

প্রঃ—বয়স কত ?

উঃ—৯ ও ৩ বৎসর।

প্রঃ—কিভাবে তাদের মৃত্যু হয় ?

উঃ—অপমৃত্যু ঘটে দুজনেরই। একজনার আগুনে পুড়িয়া আর একজনার জলে ডুবিয়া।

প্রঃ—আপনারা কি খেয়ে থাকেন ?

উঃ—আমি ও অশ্বিনী খাই তাল। আর নিতাই চোষে তালের আঁঠি।

প্রঃ—যাক, আপনার মুক্তির জন্য আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।

উঃ—দয়া করিয়া পিণ্ড দিবেন।

প্রঃ—আপনার গোত্রটা বলুন।

উঃ—উহা বলিতে পারি না।

প্রঃ—সে কি, ব্রাহ্মণের ছেলে—নিজ গোত্র জানেন না! আমার মনে হয় আপনি উহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আচ্ছা স্মরণ করাইয়া দিতেছি ইহার মধ্যে কোনটা বলুন—কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য।

উঃ—ঐ শেষেরটা। উহা আমি ভুলি নাই। কিন্তু উচ্চারণ করিতে পারি না।

[মনে হইল শাণ্ডিল্য ঋষি ভক্তিশাস্ত্র প্রণেতা, তাই তাঁহার পবিত্র নাম বলিতে বা লিখিতে পারে না।]

প্রঃ—বলুন তো নন্দ ঘোষের ছেলের নাম কি?

উঃ—না-না-না-না-না-না-না।

প্রঃ—দশরথের বড় ছেলের নাম কি?

উঃ—না-না-না-না-না-না-না।

[ভাবিলাম এই জন্যেই বোধ হয় 'ভুতের মুখে রাম নাম' কথাটার দ্বারা অসম্ভব কোন ব্যাপার বুঝাইয়া থাকে।]

প্রঃ—শাণ্ডিল্যের নাম করিতে পারেন না, তবে গঙ্গায় ডুবিয়াছেন বলিতে 'গঙ্গা'—নাম কি করিয়া করিলেন?

উঃ—তাহা পারি।

প্রঃ—তাহা পারি বলিলেই হইল। ঋষির নাম বলিতে পারেন না, অথচ গঙ্গাদেবীর নাম বলিতে পারেন! এ কিরূপে হয়?

উঃ—উহা পারি না।

আমি—কি যে বলেন বুঝি না। একেই বলে ভূতুরে কাণ্ড! একবার বলেন গঙ্গার নাম বলিতে পারেন এবং বলিলেনও। আবার বলিলেন উহা পারেন না। ভূতদের কথায় বুঝি সামঞ্জস্য থাকে না।

উঃ—আপনি নিজেই ভুলিয়া গিয়াছেন কখন কি বলিয়াছেন।

প্রঃ—কি ভুলিয়া গিয়াছি? কি বলিয়াছি? ও বুঝিয়াছি!

[গঙ্গা বলিতে পারে, গঙ্গাদেবী বলিতে পারে না।]

বলুন তো গঙ্গা নদী।

উঃ—গঙগা নদী।

আমি—এইবার লিখুন তো গঙ্গাদেবী।

উঃ—না-না-না।

আমি—লিখুন পদ্মানদী।

উঃ—পদ্মানদী।

আমি—পদ্মাদেবী।

উঃ—না-না-না।

আমি—লিখুন তো কালী।

উঃ—কালী।

আমি—কালীঘাটের কালীমাতা।

উঃ—না-না-না।

আমি—তবে আগে লিখিয়াছেন কি দোয়াতের কালি ভাবিয়া ?

উঃ—ঠিক তো ধরিয়াছেন।

আমি—লিখুন তুলসী।

উঃ—না।

আমি—লিখুন বেলপাতা।

উঃ—না।

ননী—লিখুন বাবলাপাতা।

উঃ—বাবলাপাতা।

আমি—ব্রাহ্মণ।

উঃ—না।

আমি—ক্ষত্রিয়।

উঃ—না।

আমি—বৈশ্য।

উঃ—বৈশ্য।

[জানিতাম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণই দ্বিজাতি। ইহাদের মধ্যে কেন এরূপ ইতর বিশেষ হইল তখন বুঝিতে পারি নাই। পরে একদিন গীতা পড়িতে পড়িতে এই পার্থক্যের কারণ বুঝিলাম। শ্লোকটি এই ঃ

"মাংহি পার্থ! ব্যাপাশ্রিত্য যেহপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্ততা শূদ্রাস্তেহপিকান্তি পরাংগতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাভক্তা রাজর্ষয়স্ততা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্বমাম॥"

এখানে স্ত্রী বৈশ্য শূদ্রকে একদলে এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রাজর্ষিদের অন্য দলে ফেলা হইয়াছে দেখা যায়। বৈশ্য পাপযোনি।]

প্রঃ—লিখুন খৃষ্ট।

উঃ—না।

প্রঃ—মহম্মদ।

উঃ—না।

প্রঃ—কৃষ্ণ ও রামের নাম করিতে অতগুলি 'না' কেন লিখিলেন ?

উঃ—শুনিলে বড় বেশী যন্ত্রণা হয়।

প্রঃ—আমরা যদি আপনাকে প্লানচেটে আটক রাখিয়া অনবরত ঐ নাম করি, তবে কি হয় ?

উঃ—দয়া করিয়া তা করিবেন না। বড় বেশী কষ্ট হইবে।

প্রঃ—যদি বাড়িতে অষ্টপ্রহর নামকীর্তন করাই ?

উঃ—তবে বাড়ির বাহিরে চলিয়া যাইব।

প্রঃ—কীর্তন থামিলে ?

উঃ—আবার আসিব।

প্রঃ—আবার কেন আসিবেন ?

উঃ—না আসিয়া থাকিতে পারিব না।

প্রঃ—আপনি বাড়ির কাহারও ক্ষতি করিবেন না, ইহাতে খুবই

সুখী হইলাম। ছেলেপিলেরা আপনার নামে অত্যন্ত ভয় পায়।

উঃ—আমি তো বলিয়াছি আমার দ্বারা কোন ভয় নাই।

প্রঃ—কিছু খাবেন ?

উঃ—খাব।

প্রঃ—কি খাবেন ?

উঃ—তাল হইলেই ভাল হয়।

প্রঃ—উহা তো এখন মেলে না।

উঃ—তবে মাছ।

প্রঃ—কিরূপ মাছ ?

উঃ—তাজা।

আমি—আচ্ছা আপনাকে মাছ দিব। আর কিছু কি বলিবেন ?

উঃ—পিণ্ডটা দিতে যেন বাধা না হয়।

[পরদিন একটা গোটা ইলিশ মাছ তেতলার ছাতে ফেলিয়া রাখা হয়। ঘণ্টা খানেক পরে সেখানে গিয়া তাহা দেখা গেল না। কেহ বলিল তারানাথ নিয়াছে, কেহ বলিল বাজপাখিতে নিয়াছে অথচ দোতলার একটি ঘর হইতে দিন দশেক বাদে একরাশ ইলিশ-মাছের আঁশ পাওয়া গেল।]

শ্রীমা

আমি—কে আপনি ?

উঃ—মা।

আমি—আপনি কোথায় আছেন ?

উঃ—তপলোক।

আমি—যে প্লানচেট ধরিয়াছে তাহাকে চেনেন ?

উঃ—আগে চেনতাম না, এখন চিনি।

আমি—ইহাকে আপনি কিছু উপদেশ দিন।

মা—ননী, তুই মহাভারত পড়িচ্ আর তোর বাবার ধারে থাকিচ্।

[আমি যখন এই লেখাটা পড়িলাম তখন ননী বোধ হয় পড়িচ্ থাকিচ্ শুনিয়া হাসিল।]

তুই হাসচ্ কেন্? সতীশ তুমি ওকে মন্ত্র দেওয়াইও।

ননী—মা আপনি আমার বাবাকে একটু ভাল করিয়া বলুন যাতে আমায় মন্ত্র দেওয়ান। বাবাকে আমি একথা বলিয়া হয়রান হইয়াছি।

মা—সতীশ, কেন্ তুমি ওরে মন্তর দেওয়াও না?

আমি—মা, গুরু পাওয়াই ভার। অল্প বয়স্ক বিধবাদের মন্ত্র দিবার মত গুরু পাওয়া আরও কঠিন।

মা—কেন্? তুমি নিজেই তো দিতে পার।

আমি—সে কি মা! আমার নিজেরই তো কিছু হইল না। মেয়েকে ঠকাইয়া আর লাভ কি? একখানা কাপড় বা বার্ষিকের একটা টাকার প্রত্যাশাও নাই! আসল কথা আমি নিজেকে ও কাজের উপযুক্ত মনে করি না।

মা—আমি বলি তুমি মন্তর দিতে পার।

আমি—আমি মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি না। যদি আপনি ঠিকই বোঝেন যে আমি ঐ কাজের উপযুক্ত তবে যেন একটা মন্ত্র পাঠাইয়া দেন।

ইহার আট-দশ দিন পরে রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি আমি যেন আসন করিয়া বসিয়া আছি, আমার পাশে যেন একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। চাহিয়া দেখিলাম সে বিধবা। কিন্তু তাহার শরীরের সঙ্গে আমার মেয়ের শরীরের সামঞ্জস্য নাই। মুখের দিকে চাহিয়া দেখি স্কন্ধের উপরটা আর দেখা যায় না। একটি নূতন ধরণের অতি সুন্দর মন্ত্র আমি যেন ঐ স্ত্রীলোকটিকে দিতে

যাইতেছি। মন্ত্র দিয়াছি তাহা কিন্তু স্বপ্নে দেখিলাম না। পরদিন সকালে ননীকে বলিলাম, 'মন্ত্র তো পাইয়াছিলাম কিন্তু কান খুঁজিতে গিয়া তোর মুণ্ডটাই পাইলাম না।' সব শুনিয়া ননী বলিল, 'ঐ মন্ত্রই আমার। আপনি মায়ের কথাও শুনিবেন না?' আমি বলিলাম, 'তোর জন্য মন্ত্র পাঠাইলেন তো তোর মুণ্ডটা দেখাইলেন না কেন? সম্পূর্ণ ঠিক না বুঝিয়া আমি অগ্রসর হইতে চাই না। তুই যতই পীড়াপীড়ি করিস্ না কেন আমি কিছুতেই ও কাজ করিব না।'

[শ্রীদাদা ও শ্রীমায়ের ফটো আমার স্ত্রীর নিকটে জগদীশই রাখিয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়াই মায়ের আত্মা আনানো হইয়াছিল।]

শ্রীদাদা (২)

পিরোজপুরের উকীল হীরালাল মুখোপাধ্যায়কে আমি দাদা বলিয়া ডাকিতাম। তিনিও আমাকে সহোদরের মত ভালবাসিতেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া একদিন ননীকে বলিয়া শ্রীদাদার আত্মা আনান। তিনি সস্ত্রীক শ্রীদাদা-মায়ের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান বলিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবার্থ উৎসর্গ করিয়া উইল দ্বারা সেবায়েৎ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়ে শ্রীদাদার সঙ্গে তাঁহার প্লানচেটের মারফতে কথাবার্তা হয়। ঐ সময়ে তিনি শ্রীদাদাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সতীশের বর্তমান ছেলেটি বাঁচিবে তো?'

শ্রীদাদা—হাঁ, এটি বাঁচিবে। সতীশ তুমি তুমার এই ছেলেটিকে সারবিদ্যা শিক্ষা দিও।

[আমি 'সারবিদ্যা' দ্বারা সংস্কৃত বিদ্যা বুঝিলাম। তাই শ্রীদাদাকে ও বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করিলাম না। আমার কনিষ্ঠ

পুত্র তখন খুবই ছোট। কিছুদিন পরে আমি উহাকে টোলে সংস্কৃত পড়াইব বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল সে দুপুরে স্কুলে যাইবে এবং সকালে কি সন্ধ্যায় টোলে পড়িবে। এই উদ্দেশ্যে উহার ও দৌহিত্রের জন্য যে গৃহ-শিক্ষকটিকে বাটীতে রাখিয়াছিলাম, তাহাকেও টোলে গিয়া সংস্কৃত পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলাম। গৃহ শিক্ষকটি সিটি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম তাহার দেখাদেখি আমার ছেলে ও তাহার সঙ্গে টোলে যাইতে আপত্তি করিবে না। শিক্ষকটিও বি. এ-তে সংস্কৃতে অনার্স লইয়া ভবিষ্যতে ভাল ফল করিতে পারিবে। আর আমার পুত্রেরও সারবিদ্যা পড়া হইবে। কিন্তু শ্রীমান কিছুতেই টোলে পড়িতে রাজি হইল না। সে বলিল যে সে টোলে পড়িয়া পুরুতঠাকুর হইয়া গামছা স্কন্ধে করিয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিতে পারিবে না। শিক্ষকটিকেও রাজি করাইতে পারিলাম না। এইরূপে আমার ধারণানুযায়ী সারবিদ্যা শিখাইবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

[বহুদিন পরে একদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িতে পড়িতে সারবিদ্যার প্রকৃত মর্মের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইল।

"প্রভু কহে, কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে, কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।"

ইহার পূর্বেও আমি একাধিকবার চৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়াছিলাম। তাহাতেও সারবিদ্যা কি, কার্যকালে তাহা আমার মনে পড়ে নাই। আর যে ননী একবারও চৈতন্যচরিতামৃত পড়ে নাই তাহার পক্ষে সেই গ্রন্থের ভাষায় লেখা বা চিন্তা করা অসম্ভব। একমাত্র শ্রীদাদার মত শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত ভক্ত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের নিত্যপাঠকের পক্ষেই ওরূপ ভাষা প্রয়োগ করা সম্ভবপর।]

ছোড়দিদি

[ইনি বরিশাল জিলায় বানাড়িপাড়ার খ্যাতনামা হেডমাষ্টার রজনীকান্ত গুহঠাকুরতা মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং কালীকান্ত মিত্র মহাশয়ের স্ত্রী। আমি তাঁহাকে ছোড়দিদি বলিয়া ডাকিতাম।]

বহু অকাট্য প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও প্লানচেটের সত্যতা সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ নূতন পরীক্ষা করিবার ইচ্ছাটা আমার কিছুতেই নিঃশেষে কমিয়া যায় নাই। হঠাৎ একদিন ছোড়দিদির কথা মনে হইল। ননী ছেলেবেলা পিরোজপুর হইতে আসিয়াছে। ছোড়দিদির নামটা জানা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে উহা জানে কিনা। সে উত্তরে বলিল যে, সে কখনও তাঁহার নাম শুনে নাই। আমি ও আমার স্ত্রী ছোড়দিদি ডাকিতাম শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে সে কখনও ছোড়দিদি, কখনও পিসীমা ডাকিত। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সেও কোনদিন তাঁহার নাম শুনে নাই। সুতরাং ছোড়দিদির আত্মা আসিয়া যদি তাঁহার নাম লিখিয়া দেন, তবে বুঝিতে হইবে ব্যাপারটি কৃত্রিমতাশূন্য। অতএব ননীকে তাঁহার আত্মা আনিতে বলিলাম।

প্রঃ—কে ?

উঃ—আমি ছোড়দিদি।

আমি—আসল নামটি বলুন। না বলিতে পারিলে বুঝিব আপনি অন্য কেহ, ছোড়দিদি না। সুতরাং আপনার সঙ্গে একটি কথাও বলিব না।

উঃ—মনোরমা।

প্রঃ—আপনি কোথায় আছেন ?

উঃ—নামলোকে।

আমি—নামলোক তো খুবই উঁচুতে। ওখানে বরিশালের জগদীশবাবু আছেন। অশ্বিনীবাবুও ওখানেই আছেন।

উঃ—হাঁ, অশ্বিনীবাবু আছেন শুনিয়াছি।

প্রঃ—আপনি কি করেন ?

উঃ—নাম করি।

আমি—বেশ আছেন! ঢেঁকিতে পার দিতে হয় না, বাসন মাজিতে হয় না, ছেলের পরিচর্যা করিতে হয় না, শুধু নাম করা!

উঃ—কি মজা!

প্রঃ—মিত্র মহাশয়ের জন্য কষ্ট হয় না ? [মিত্র মহাশয় ছোড়দিদির স্বামী।]

উঃ—না।

প্রঃ—ছেলেপিলের জন্য ?

উঃ—না।

প্রঃ—একেবারে মায়ামুক্ত। পিরোজপুরে এক আধবার যানও না ?

উঃ—কদাচিৎ যাই। ঘুরিয়া দেখিয়া আসি কে কেমন আছে।

প্রঃ—আপনি কি সর্বদাই নাম করেন ?

উঃ—হাঁ, প্রায় সর্বদা। যতটা পারি।

প্রঃ—কি নাম করেন ?

উঃ—হরিনাম।

প্রঃ—আপনারা না সর্ববিদ্যার শিষ্য, শক্তিমন্ত্রের উপাসক ? হরিনাম আবার কোথায় পাইলেন ?

উঃ—আপনিই তো দিয়াছিলেন।

[এই সময়ে ননী অভিমানের সুরে বলিল, বাবা আপনি আমাকে ফাঁকি দিয়াছেন। শ্রীমা মন্ত্র দিতে বলিলেন, এমন কি মন্ত্র পাঠাইয়াও দিলেন, তথাপি আমাকে তা দিলেন না। অথচ ছোড়দিদিকে ১৫/১৬ বৎসর আগে পিরোজপুরে থাকিতে মন্ত্র দিয়াছেন দেখিতেছি !' ইহাতে আমি যুগপৎ বিস্মিত ও অপ্রস্তুত হইলাম। সুতরাং তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য আগাগোড়া ব্যাপারটা বর্ণনা করিলাম।

ছোড়দিদির বাসায় তাঁহার এক বিধবা ছোট ভগ্নী থাকিতেন। তাঁহার নাম প্রিয়তমা বসু। ইনি গৌড়ীয় মঠের শিষ্যা, বিদুষী ও বৈষ্ণবী। ইনি ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের যোগ্যপুত্র সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের নিকট দীক্ষিতা। গৌড়ীয় মঠের অন্যান্য বহু বৈষ্ণবের মত ইঁহারও বৈষ্ণবতা ছিল খানিকটা aggressive ধরনের অর্থাৎ আক্রমণাত্মক। একদিন ছোড়দিদি আমাকে নিভৃতে বলিলেন "প্রিয় আমাকে অনেকদিন ধরিয়া বলে গৌড়ীয় মঠে গিয়া দীক্ষা নিতে। আমি ও আমার স্বামী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি সর্ব-বিদ্যা বংশের কুলগুরুর নিকট। কিন্তু প্রিয় অনেক শাস্ত্রীয় শ্লোক বলিয়া বুঝাইতে চায় ও বলে যে কলিতে বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত অপর কিছুতেই ঘাস-জল খাইবে না। এইসব বলিয়া ছোড়দিদি অতি কাতরভাবে আমার মত জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলিলাম, "আমি আপনার ভগ্নীর মত বৈষ্ণব শাস্ত্রে পণ্ডিত নই। তবে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের একটি উক্তি মনে পড়িতেছে। কোথায় যেন তিনি বলিয়াছেন, 'কালীনাম, দুর্গানাম, শিবনাম, বিষ্ণুনাম সবই হরিনাম'। তাছাড়া রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত তো একরূপ চোখের উপরই দেখা যায়। আপনার বিশ্বাসে আঘাত করা তাহার উচিত হয় নাই।"

পরে এই বিষয় লইয়া দুই ভগ্নীতে কথা কাটাকাটি হয়। প্রিয়তমা নাকি তাঁহাকে একদিন বলেন, 'সতীশবাবু তোকে তোর

মনরাখা কথা বলিয়াছেন। আচ্ছা তিনি তো শাক্ত বংশের, কিন্তু তাঁহারই কাছে জিজ্ঞাসা কর না তিনি কি নাম জপ করেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তিনি বৈষ্ণব মন্ত্র জপ করেন'। ছোড়দিদির মুখে এই কথা শুনিয়া আমার বিস্ময় জন্মিল। কারণ আমার মালা-তিলক প্রভৃতি কো বৈষ্ণব চিহ্ন কোন দিন কোন অঙ্গে নাই। তিনি কিরূপে আমাকে বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ? ছোড়-দিদি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি নিজে বৈষ্ণব কি না, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে স্বীকার করিতে হইল যে আমি বৈষ্ণব। এই সব কথা হইতেছিল তাঁহার ঘরে বসিয়া। আমি একটা চেয়ারে বসিয়াছিলাম। তিনি একখানা খাটে। ঘরে অন্য কেহ ছিল না। ছোড়দিদি বলিলেন, 'আপনার মন্ত্রটা আমার নিকট বলিতে কি আপনার কোন আপত্তি বা বাধা আছে ?' আমি বলিলাম, 'আমার কোন আপত্তি বা নিষেধ নাই।' তিনি বলিলেন তবে মন্ত্রটা বলুন।' যেই আমি মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলাম তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটিয়া আসিয়া আমার মুখের কাছে তাঁহার কানটা ব্যস্ততার সহিত এমনভাবে ধরিতে গেলেন যে, আমার ওষ্ঠাধর তাঁহার গণ্ড-দেশের উপর দিয়া ঘষিয়া গিয়া কানে ঠেকিল। আমি আমার মুখটা পিছনের দিকে সরাইয়া লইয়া একটু বিরক্তভাবে বলিলাম, "ছিঃ, ছোড়দি! আমি আপনাকে অতি গম্ভীর প্রকৃতির স্ত্রীলোক বলিয়া জানি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখি। আপনার পণ্ডিতা ভগ্নীকে বরং কিছু চপল মনে করিয়া থাকি। কিন্তু আপনিও যে এরূপ ভাবে চপলতা প্রকাশ করিতে পারেন ইহা আমার ধারণার অতীত ছিল।" তিনি কিন্তু আমার মন্তব্যে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'এখন আপনি বকুন আর মারুন, কিছুতেই আমার আপত্তি নাই। আমি আমার কাজ হাসিল করিয়াছি।'—এই কথা বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে হাতে তালি দিতে লাগিলেন।

পূর্বোক্ত ঘটনাটিকে আমি একটি নিরর্থক সাময়িক চাপল্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু প্লানচেটের লেখা 'আপনিই তো (মন্ত্র) দিয়াছিলেন দেখিয়া আমার সব কথা মনে পড়িল এবং তিনি যে ঐ মন্ত্রটিকে গুরুদত্ত মন্ত্ররূপে চিরকালের জন্য ধরিয়া বসিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। মনে হইল ছোড়দিদি কবীরের পন্থা অবলম্বনে কৌশলে মন্ত্র আদায় করিয়াছিলেন। আরও মনে হইল শিষ্য নিজের বিশ্বাস ও নিষ্ঠার বলে গুরুর সাহায্য ব্যতীতও অনেক কিছু করিতে পারে।]

আমি—আমি কিন্তু আপনার সেদিনকার সেই ব্যবহারটাকে নিছক চাপল্য ছাড়া আর কিছুই মনে করিয়াছিলাম না।

উঃ—আমি কিন্তু তদবধি আপনাকে গুরু বলিয়াই মনে করিতাম এবং আপনি আর পিরোজপুরে ফিরিয়া গেলেন না বলিয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইয়াছি।

প্রঃ—কই, আপনি তো আমাকে কিছুই জানান নাই।

উঃ—প্রিয় জানিত।

আমি—ওহো! এখন মনে পড়িতেছে। তিনি এক সময়ে আমাকে কলিকাতায় বসিয়া বলিয়াছিলেন,—ছোড়দিদি আপনার বিষয়ে কোন কথা উঠিলেই চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া যান। আমি এতই নির্বোধ যে তাঁহার ঐ কথা তখন হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—কেন? আমার বিষয়ক কথা-গুলিতে কি লঙ্কা মাখানো থাকে? এখন কিন্তু বলি, ধন্য আপনি ছোড়দিদি! আপনার কাছে শিখিবার অনেক কিছু আছে। আপনি তো অনেক উপরে আছেন, আমাকে টানিয়া তুলিতে পারিবেন তো?

উঃ—হাঁ হাঁ হাঁ—নিশ্চয়।

প্রঃ—আর কোন কথা বলিবেন ?

উঃ—আপনার বাবার সঙ্গে একদিন দেখা হইয়াছিল।

প্রঃ—আপনাকে তিনি চিনিতে পারিলেন ?

উঃ—আমি তাঁহাকে আগে চিনিয়া আমার পরিচয় দিয়াছিলাম।

প্রঃ—কোন কথা হইল ?

উঃ—হাঁ ননীর কথা, খোকনের কথা।

প্রঃ—ননীর কী কথা ? প্লানচেটের কথা ?

উঃ—না, বিধবা হইবার কথা।

প্রঃ—আচ্ছা, আপনি ঐ দেওয়ালের গৌরাঙ্গদেবের ছবিখানা নাড়াইতে পারেন ?

উঃ—বোধ হয় পারি।

আমি—দেখুন নাড়াইতে পারেন কি না।

উঃ—না, পারা গেল না।

[ইহার পর উপযাচক হইয়া ননীকে সান্ত্বনা দেন।]

গয়ায় পিণ্ডদান

আমার দৌহিত্রকে লইয়া গয়ায় পিণ্ড দিতে যাইবার পূর্বে একদিন উপযাচক হইয়া একটি আত্মা আসিয়া প্লানচেট অধিকার করে। তাঁহার বাড়ি কোটালীপাড়া, জাতিতে বৈদ্য। সে আমাকে বলিল, আমি জানিতে পারিলাম আপনি গয়ায় পিণ্ড দিতে যাইবেন। দয়া করিয়া আমার নাম ও গোত্রটা লিখিয়া নিন। আমার পিণ্ড-টাও দিয়া আসিতে বাধা করিবেন না। পিণ্ড দিবার নামের তালিকায় তাহারও নাম-গোত্র লিখিয়া লইয়াছিলাম।

গয়ায় প্রেতশিলার উপরে উঠিয়া তারানাথ, নিতাই ও অশ্বিনীর পিণ্ড দিবার সময়ে হঠাৎ এত প্রবল বেগে একটা

বাতাস আসিল যে আমার দৌহিত্র আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, 'ঐ তারানাথ পিণ্ড খাইতে আসিয়াছে।' অবশ্য সে কিছু দেখে নাই।

খোকন (৪)

প্রঃ—কে ?

উঃ—খোকন।

প্রঃ—পিণ্ড দিয়া আসিয়াছি। পাইয়াছ তো ?

উঃ—হাঁ, পাইয়াছি।

প্রঃ—তুমি তবে এখন কোথায় আছ ?

উঃ—অমরধামেই।

প্রঃ—সে কি ? পিন্ড দিলে ঠাকুরদাদা যেখানে গিয়াছেন সেখানে (অমরলোক) যাইতে পারিবে বলিয়াছিলে। তা পারিলে না কেন ?

উঃ—ছেলের দেওয়া পিণ্ড না হইলে নাকি তা হয় না। আগে তা জানিতাম না।

প্রঃ—তবে তো পিণ্ড দেওয়ায় তোমার কিছুই লাভ হয় নাই দেখিতেছি।

উঃ—লাভ হইয়াছে। আগে যেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইত এখন আর সেরূপ বোধ হয় না।

প্রঃ—এখন তবে বেশ ভাল আছ ?

উঃ—হাঁ ভালই আছি।

প্রঃ—জামাইবাবুর খবর কি ?

উঃ—পিণ্ড পাইয়া তিনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

প্রঃ—তোমাকে ওখানে কতদিন থাকিতে হইবে বলিতে পার ?

উঃ—তা বলিতে পারি না।

হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় (২)

প্রঃ—কে ?

উঃ—হীরালাল।

প্রঃ—কেমন আছ ?

উঃ—ভালই আছি।

প্রঃ—পিণ্ড পাইয়াছ ?

উঃ—হাঁ পাইয়াছি।

প্রঃ—কোথায় আছ ?

উঃ—অমরলোকে।

প্রঃ—টমকে ডাকিব ? কিছু বলিবে ?

উঃ—না, আপনিই তো আছেন।

প্রঃ—আর কিছু বলিবে ?

উঃ—না।

[বুঝিলাম পিণ্ড পাওয়ার ফলে পূর্বকার আসক্তি যেন কাটিয়া গিয়াছে।]

আত্মা আনিবার বিপদ

এই সময়ে লোকমুখে শুনিয়া পরিচিত অপরিচিত অনেকে আসিয়া তাঁহাদের মৃত আত্মীয় আত্মীয়ার আত্মা আনিবার জন্য আমার কন্যাকে বিশেষতঃ আমাকে অনুরোধ করিতে থাকেন। কাহাকেও বিমুখ করা হয়, কাহারও অনুরোধ হয়তো এড়াইবার উপায় থাকে না। ফলে অনর্থক লোকের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কা দাঁড়াইল।

নামজাদা দেশসেবিকা মোহিনী দেবী একদিন আসিলেন তাঁহার মৃত সাব জজ স্বামীর আত্মা আনা হইল। সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু শুনিয়াছিলাম যে ননী মোহিনীদেবীর স্বামীর নাম না জানিলেও তিনি নামের নিম্নে ইংরেজীতে নিজ নাম কিভাবে দস্তখত করিতেন এ প্রশ্নের জবাবে ঠিক ভাবেই লিখিয়া দিয়াছিলেন।

আমার বন্ধু নিবারণ চন্দ্র বৈদ্য একদিন উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে আমি কালীশ পণ্ডিত মহাশয়ের আত্মা আনি। সে বাড়ি গিয়া প্লানচেট তৈয়ারী করিয়া শ্রীদাদার আত্মা আনিলে শ্রীদাদা তাহাকে আত্মা আনিতে নিষেধ করেন। নিবারণের নিজমুখে আমি একথা শুনিয়াছিলাম। কিছুদিন বিরত থাকিয়া নিবারণ আবার আত্মা আনিতে থাকে। ইহার ফল অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়াছিল। নিবারণের নিজমুখে একথাও শুনিয়াছিলাম যে কয়েকটা নীচস্তরের আত্মা তাঁহাকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছিল যে, সে প্রায় সর্বদা তাহাদের কথাবার্তা ও চীৎকার শুনিতে পাইত। নিবারণ বহুকাল প্রত্যহ নিয়মিতভাবে হরিনাম করিত। ঐ আত্মা গুলি তাহার হরিনামে বিঘ্ন ঘটাইয়া ঐ সময়ে 'ফরি ফরি' বলিয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া দিত। তাহাকে গালাগালি দিয়া বলিত,—তুই 'ফরিনাম' ছাড়্। নিবারণ মাঝে মাঝে আমার নিকট আসিয়া তাহার দুঃখের কথা বলিত। কিছুদিন পাগল চিকিৎসক গিরীন্দ্রশেখর বসুর চিকিৎসাধীনে সে ছিল। মর্মান্তিক ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করিবার ইচ্ছা বা আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ভূতেরা তাহার চরম অনিষ্ট করিয়াছিল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি ও বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস টলাইয়া দিয়া। শেষ জীবনে পরম ভক্ত 'নিবারণ' তাহার গলার তুলসীর মালা পরিত্যাগ করে, শ্রীদাদার সম্প্রদায়ে প্রচলিত লম্বা চুল কাটিয়া ফেলে এবং ধর্মজীবন ঢালিয়া সাজিবার জন্য কুম্ভ মেলায় গিয়া

নূতন গুরুর খোঁজ করে। সেখান হইতে মাদ্রাজের সুবিখ্যাত মহর্ষি রমণের কাছে গিয়া বহুদিন থাকে। সেখান হইতে রমণের লেখা একগাদা ইংরেজী বই কিনিয়া আনে। সেগুলি সে আমাকে পড়িতে দিয়াছিল। রমণের আশ্রম হইতে ফিরিয়া নিবারণ প্রায় আট-দশ মাস শুধু নারিকেল খাইয়া থাকিত। ঝুনা ও ডাব একত্রে মোট ছয়টি করিয়া নারিকেল প্রত্যহ খাইত। ফলে স্থূলকায় নিবারণের দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। তারপর অনেক-কাল নিবারণের আর দেখা নাই। একদিন তাহার কার্যস্থলে গিয়াও দেখা পাইলাম না। অনুসন্ধানে জানিলাম কিছুদিন পূর্বে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। আমার মনে হইল নিবারণের ন্যায় উন্নত-হৃদয় সাধুপ্রকৃতির লোকের এই চরম পরিণতির জন্য খানিকটা আমিও দায়ী। কি কুক্ষণে শ্রীদাদার 'তুমার ও তুমরা' লিখিবার কারণ আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। নতুবা তাহার এই ভুতুড়ে কাণ্ডের খপ্পরে পড়িবার কারণ হয়তো ঘটিত না। আবার ভাবি তাহার মত শ্রীদাদার ভক্ত শিষ্য যে (দাদা ও মা তাহাকে বিশেষ আদর করিয়া 'খোকা' বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীদাদার ভক্তগণ তাহাকে হয় খোকা না হয় খোকাদাদা নামেই ডাকিত ও চিনিত) দাদার আদেশ অমান্য করিয়াও আত্মা আনিতে লাগিল ইহা তাহার বলবান দুর্দৈবের প্রেরণায়ই ঘটিয়াছিল। এই ভাবিয়া নিজের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ লঘুতর করিতে চেষ্টিত হই। সেদিন নিবারণের ছাত্র সুপরিচিত সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র বাগল নিবারণ সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছে দেখিয়া মনে হইতেছিল নিবারণ সম্বন্ধে আমি যা জানি তা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাও পাঠকদের নিকট কম হৃদয়গ্রাহী হইবে না। কার্যতঃ কি হইবে বর্তমানে তাহা ভবিতব্যের গহ্বরে নিহিত থাকিল।

আমার অপর একজন বন্ধু টিউবওয়েল বিশেষজ্ঞ বিপদবারণ সরকারের ঐ সময়ে কন্যা বিয়োগ ঘটে। সেও আমার বাসায়

আসিয়া তাহার কন্যার আত্মা আনাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু তাহার মেয়েকে আমার মেয়ে ননী কখনও দেখে নাই। তাহার কোন ফটোও নাই। তাই নিবারণ বাড়িতে গিয়া প্লানচেট তৈয়ারী করিয়া নিজে নিজে তাহার আত্মা আনিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সবার হাতে আত্মা আসে না। তাহার বহুসংখ্যক অনুচরের মধ্যে একাধিক ব্যক্তিও তাহার দেখাদেখি প্লানচেট লইয়া বসিয়া যাইত। তাহার মধ্যে উপেন দাস নামে এক যুবকের হাতে আত্মা আসিতে লাগিল। সংবাদ পাইয়া আমি মাঝে মাঝে বিপদবারণের আখড়ায় যাইয়া ঐসব দেখিতাম। আমি লক্ষ্য করিলাম উপেনের হাতে নীচস্তরের আত্মাই আসে। নীচস্তরের আত্মারা প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে, এখানে তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। নিবারণকেও এই শ্রেণীর আত্মারা বহু মিথ্যা কথা বলিয়া নানাভাবে বিব্রত করিয়াছিল। আত্মগোপন করিয়া কেহ বলিত 'আমি বিবেকানন্দ', বলিত 'আমি পরমহংস' ইত্যাদি। এবং সরল বিশ্বাসী বিপদ-বারণ তাহাদের কথানুযায়ী কাজ করিতে গিয়া নানাভাবে বিপন্ন হইত; একবার তো অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছিল।

বিপদবারণের এই সঙ্গীটির হাতে একদিন আমার উপস্থিতিতে আসিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার। ইনি ছিলেন সিমসন্ হত্যাকাণ্ডে বিনয় বসুর সহকর্মী। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলিলেন, "বিপদবারণবাবু, আপনি তো টিউবওয়েল করিতে খুব ওস্তাদ। দয়া করিয়া গোপনে একটা deep tubewell এমন ভাবে করুন যে আমাদের এখানে বসিয়া আমরা জল তুলিতে পারি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন? আপনাদের ওখানে কি জল নাই?

উত্তর হইল—আছে। কিন্তু শ্যালারা খাইতে দেয় না। তাই গোপনে টিউবওয়েল বানাইতে চাই।

আমি—আপনারা না কর্মযোগী? আপনারা না নিষ্কামভাবে সাহেব মারিয়া গীতাধর্ম পালন করিয়াছেন? তবে এখন এই জলের অভাবে নরক যন্ত্রণা কেন?

উঃ—তাই তো এখন দেখি। তবে আমরা দমি নাই। শ্যালাদের গ্রাহ্য করি না। জোরে তারে চলি।

আমি—ঐ শ্যালারা কারা?

উঃ—শ্যালারা এখানকার পাহারাওয়ালা।

আমি—ওখানে কি কি করেন?

উঃ—Movement watch করি।

আমি—কিসের Movement?

উঃ—বন্দুক, টাকাকড়ি ও পুলিশের Movement।

আমি—কোথাকার পুলিশ?

উঃ—পৃথিবীর।

আমি—অর্থাৎ এখানে কে কোথায় বন্দুক আর টাকাকড়ি রাখে এবং পুলিশরা কোথায় থাকে কোথায় যায় এই সবের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। যেমন বাঁচিয়া থাকিতে রাখিতেন সেইরূপ?

উঃ—হাঁ তাইাই করি। এজন্য আমরা সমগ্র বাংলাকে বহু ডিভিসন ডিষ্ট্রিক্ট ও সাবডিভিসনে ভাগ করিয়া নিয়াছি।

প্রঃ—আপনারা ভাগ করিবেন কেন? ভাগ তো করাই আছে।

উঃ—ওদের ভাগ আর আমাদের ভাগ স্থানে স্থানে মেলে না।

আমি—তারপর?

উঃ—এক একজন এক একটা division এর charge-এ আছে এবং তার অধীনে district গুলির charge-এ এক একজন করিয়া আছে। এবং তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে সাবডিভিসনের চার্জে একজন করিয়া আছে।

আমি—অর্থাৎ যেমন কমিশনার-ম্যাজিস্ট্রেট-সাবডিভিশনাল অফিসার।

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—এরূপ করিয়া কি হইবে? বন্দুক বা টাকা সংগ্রহ করিতে বা তার দ্বারা কোন কাজ করিতে পারিবেন কি?

উঃ—তা জানিনা। তবে কাজ করিয়া যাইতেছি।

প্রঃ—এতকাল পরে এখন তবে সত্যই নিষ্কাম কর্ম করিতেছেন। একেবারে ফলাশা বর্জিত!! শুনিলাম কাল নাকি বিপদবারণের মেয়েটিকে আপনি একটা চড় মারিয়া প্লানচেট হইতে নামাইয়া দিয়াছিলেন। সে তাহা বলিয়া তাহার বাবার নিকট আপনার নামে নালিশ করিয়াছিল। আপনি তাহাকে মারিলেন কেন? সে তো ছেলেমানুষ আর আপনি না একজন বীর?

উঃ—তাহার বাবার লোকেরা প্লানচেট ধরে বলিয়া সে ছুঁড়িটা একাই প্লানচেট আমল করিয়া থাকিবে, আমাদের একটু কথা বলিবার সুযোগ দিবে না, তাই মারিয়াছিলাম।

এই শ্রেণীর আত্মারা জোর জবরদস্তি করিতে বা চড়চাপড় মারিতে পারিলেও ইহারা মিথ্যা কথা বলা, প্রবঞ্চনা করা বা কাহারও ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া তাহাকে পাগল করিয়া দিবার মত নীচ প্রকৃতির হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বিপদবারণের ওখানে অসৎ আত্মারা যথেষ্ট আসিত।

নীচ আত্মা

বিপদবারণের বাসায় গিয়া একদিন শুনিলাম তাহার সেই লোকটির উপর না কি মেহেরের কালীর আবেশ হইয়াছে এবং সে বিড়বিড় করিয়া আপন মনে কি সব বলিতেছে। আমি যাইতেই

বিপদবারণ বলিল, "দাদা, এর কি করা যায়? ও তো বলে আমাকে ছুঁবি না। আমি মেহেরের কালী। আমাকে পূজা দে। আর এই ছবিখানা (শ্রীকৃষ্ণের) সরাইয়া ফেলিতে বা উলটাইয়া রাখিতে বলে। ওকে ছুঁইলে আর ওর কথা না শুনিলে আমার নাকি গুরুতর অনিষ্ট হইবে। আমি সব দেখিয়া শুনিয়া বলিলাম, 'কালী বৈষ্ণবী, তিনি কখনও শ্রীকৃষ্ণের ছবির প্রতি অবজ্ঞা দেখাইতে পারেন না। নীচ আত্মার (ভূতের) আবেশ হইয়াছে।' বিপদবারণ বলিল, 'আমি কালীকে ডরাই কিন্তু ভূতকে ডরাই না। আপনি তো ঠিক বোঝেন যে কালী না।' আমি বলিলাম, 'ঠিকই বুঝিতেছি'। তখন বিপদবারণ নিজের কোমরে কাপড় জড়াইয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিবার মতলবে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই সে বলিয়া উঠিল, 'দেখ্ মাস্টার, (বিপদবারণ বি. এ. পাশ করিবার পর কয়েক বৎসর স্কুল-মাস্টারী করিয়াছিল) আমাকে ছুঁবি না, ছুঁইলে তোর আর রক্ষা নাই।' তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বিপদবারণ তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে গেল, সে অমনি তাহার পরিধানের বস্ত্রখানা ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইয়া ছুটিয়া রাস্তায় চলিয়া গেল। তারপর কয়েকদিন তাহার আর সন্ধান মিলে নাই। সাত-আট দিন পরে একদিন রাত্রে উলঙ্গ অবস্থায় সে বিপদবারণের বাসায় ফিরিয়া আসে। তাহার আত্মীয়রা তাহাকে দেশে লইয়া যায়। সেখান তাহারা নানারূপ চিকিৎসা করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করে।

উপসংহার

পূর্বোক্ত এইসব অবাঞ্ছিত ঘটনার কথা শুনিয়া ননী পাগল হইবার ভয়ে আর প্লানচেট ধরিতে অনিচ্ছুক হইয়া পড়ে। তাছাড়া গয়ায় পিণ্ড দিবার পরে জামাতা হীরালালের আত্মা আনিয়া যখন

দেখা গেল যে তাহার আর পূর্বের ন্যায় তাহার প্রতি কি ছেলে-মেয়ের প্রতি আসক্তি নাই, তখন স্বভাবতই এ ব্যাপারে ননীর আর আগ্রহ রহিল না। আমিও আর এজন্য তাহাকে কখনও অনুরোধ করি নাই। অন্যেরা পীড়াপীড়ি করিয়া দুই একবার তাহার দ্বারা আত্মা আনাইয়াছে, কিন্তু সেগুলির ফল নেহাৎ মামুলি ধরণের। আগেকার মত চমকপ্রদ কিছুই তাহা হইতে পাওয়া যায় নাই। তবে এইসবের ফলে আমার নিজের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে।

এই ব্যাপারগুলি চিন্তা করিয়া আমি প্রভূত আনন্দ পাই। লেখাগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে যেন ধর্মপুস্তক পাঠ করিবার পবিত্র আনন্দ উপভোগ করি। ইহার ফলে আমার ধর্মবিশ্বাস, শাস্ত্রবিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে। অনেক কিছু—যাহা পূর্বে মানিতাম না বা গ্রাহ্য করিতাম না, তাহা মানিতে ও গ্রাহ্য করিতে পারি কি না পারি,—সেগুলি মানা ও গ্রাহ্য করার ঔচিত্য সম্বন্ধে সন্দেহহীন হইয়াছি।

আর একটা ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়াছে। সাধারণতঃ যাঁহারা আত্মা আনেন তাঁহারা প্রায়শঃ পারলৌকিক তথ্য বা তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা লইয়া তাহা করেন না অথবা আর্তের ন্যায় মহৎ আত্মার শরণ লন না। তাই সব সময়ে সুফল পাওয়া যায় না। ইহলোকে যাঁহারা কারুণিক পরলোকে গিয়া তাঁহারা অন্যরূপ ধারণ করিতে পারেন না। শুদ্ধ চিত্তে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতে পারিলে তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করেন। তবে ঐহিক ব্যাপার লইয়া তাঁহাদের জ্বালাতন করিলে এখানকার মত ওখানেও তাঁহারা ভাল ভাবে গ্রহণ করেন না।

হরিনামের শক্তি, গুরুদত্ত মন্ত্রে বিশ্বাসের শক্তি, গয়ায় পিন্ডদানের উপকারিতা এবং আত্মহত্যার ভয়াবহ পরিণতি—এই চারিটি বিষয়ের গুরুত্ব ঘটনাবলীর মধ্য হইতে এমনভাবে ফুটিয়া

উঠিয়াছে অত্যন্ত নাস্তিক ব্যক্তিও ইহা যুক্তিতর্ক দ্বারা উড়াইয়া দিতে পারিবে না এবং আস্তিকদের আস্তিক্যবুদ্ধিও ইহা হইতে নূতন রস ও শক্তি সঞ্চয় করিবে। বিজ্ঞানের থিওরীগুলি যেমন এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট দ্বারা সমর্থিত হইলে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, পরলোক সম্বন্ধীয় শাস্ত্রবাক্য ও প্রচলিত বিশ্বাসসমূহও প্লানচেট দ্বারা যেন এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের মতই সমর্থিত হইয়া সহজবোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

॥ সমাপ্ত ॥